প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশিকা : প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : শীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস,
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলকাতা—৬

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মল্লিনাথ
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে

এই রচনাটি বেরিয়েছিল ১৩৮৭ সালের শারদীয় অমৃত পত্রিকায়। তারপর লেখার উপর অনেক কলম চালিয়েছি। কেটেছি, বাড়িয়েছি। প্রায় নতুন লেখা। কলেজ স্ট্রীট পাড়ার ভাষায় বলা যেতে পারে—পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত।

বইটি সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে লেখা। লেখায় সময় আমি আমার শান্তিনিকেতন-জীবনেই ফিরে গিয়েছিলাম। ফিরে গিয়েছিলাম আমার কৈশোর যৌবনের বন্ধুদের কাছে। তাদের কথা এই বইয়ে বারবার এসেছে। এসেছে আমার মাস্টারমশাই ও অন্য কর্মীদের কথা। তাদের কাছে আমার ঋণ অশেষ।

এমনিতেই বহু নামে বইটি ভারাক্রান্ত। তবু অনেক নাম বাদ পড়েছে। তার মানে এই নয়, ওদের আমি ভুলেছি। ভুলিনি। রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

অমিতাভ চৌধুরী

পুনশ্চ। এতো তাড়াতাড়ি পুনর্মুদ্রণ? অবাক কাণ্ড। যাই হোক, তাতে আমার লাভ, প্রকাশকের লাভ। একটু ঘসামাজা করেছি, ছাপার ভুল শুধরেছি। তাই একে সংস্করণ বলা যেতে পারে।

অ. চৌ.

১

আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই রবীন্দ্রনাথ নেই. কিন্তু তখনই বোধহয় শান্তিনিকেতনের দিনগুলি সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে উচ্ছল। সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক পরেই তো আকাশে রঙের ঝরনা নামে। অন্ধকার নামার আগে সে-ই বোধহয় শেষ বর্ণচ্ছটা।

তখনও চুয়াল্লিশকে বলি চৌচল্লিশ. ধুতিশার্টের সঙ্গে পরি ফিতেওলা শু এবং রবীন্দ্রনাথকে বলি রবি ঠাকুর। শুধু তাই নয়, শাড়িব্লাউজপরা জলজ্যান্ত একটি মেয়ের সামনে পড়লে চোখ নামিয়ে তিনবার ঢোঁক গিলি। কোথায় সেই সিলেটের এক অজ পাড়াগাঁর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, আর কোথায় এই আম্রকুঞ্জ-বর্ষামঙ্গল-সহশিক্ষায় আকীর্ণ বিশ্বভারতী কলেজ—যার পোশাকী নাম শিক্ষাভবন!

ছোটবেলা সেই চার বছর বয়সে বাবা আমার বর্ণপরিচয় করিয়েছিলেন সহজ পাঠ দিয়ে। আর ছ' বছর বয়সে মামাবাড়ি শ্রীগৌরীতে যখন পড়তে যাই, বাবা নিজের হাতে একটি খাতায় লিখে দিয়েছিলেন বেদ-উপনিষদের কিছু শ্লোক। বাবা-কাকা-পিসিদের কাছে অনবরত শুনতাম রবীন্দ্রনাথের গান—সহসা ডালপালা তোর উতলা যে, মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি, গানের সুরের আসনখানি ইত্যাদি। একটু বড় হয়ে প্রবাসীতে পড়তে লাগলাম রবীন্দ্রনাথের লেখা. আর দেখতে লাগলাম শান্তিনিকেতনের ছবি। ওগুলো আমার মনে দাগ কেটেছিল এবং তখনই মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম বদরপুর রেল জংশনের কাছে মামাবাড়ি শ্রীগৌরী গ্রাম কিংবা শিলচর থেকে কুড়ি মাইল দূর বাবা-ঠাকুরদার কর্মস্থল বড়থল চা-বাগান আমার জন্যে নির্দিষ্ট নয়, আমাকে যেতে হবে শান্তিনিকেতন, যেখানে মহর্ষিদেব ধ্যানের আসন পেতেছিলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ছড়ানো।

অস্বচ্ছল পরিবার, তবু ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমার সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত হল মা ও বাবার সম্মতি। এলাম কলকাতায়।

সেই প্রথম আসা। শিলচর থেকে সুরমা মেলে জগন্নাথ ঘাট। স্টিমারে পদ্মার ওপারে সিরাজগঞ্জ। ফের ট্রেনে শিয়ালদা। সন্ধ্যার অন্ধকারে কলকাতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। ব্ল্যাকআউট, ব্যাফলওয়াল, গোরা সৈন্যের দাপট। হাওড়া থেকে বোলপুর চার ঘণ্টার রাস্তা। থার্ড ক্লাস ভাড়া এক টাকা চৌদ্দ আনা। তালতলার এক আত্মীয়বাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মা বাবা আর আমি উঠলাম ভোরের কিউল প্যাসেঞ্জারে। সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে বোনপাস গুসকরা ভেদিয়া, তারপরই বোলপুর। এই রেলস্টেশন নিয়ে পরে ছড়া বানানো হয়—গুসকরা বোনপাস, ভাই ফেল বোন পাশ।

বোলপুরে নেমে দেখি স্টেশন মানে একতলা একখানা পুরোনো বাড়ি। বাইরে কয়েকখানা গরুর গাড়ি আর একটি নীল বাস। রিকশা ট্যাক্সি বা অন্য যাত্রীবাস ধারে কাছেও নেই। নীল বাস বিশ্বভারতীর। স্টেশন থেকে যিনি বাস চালিয়ে শান্তিনিকেতন যান, তাঁর নাম নীলমণি গায়েন। পরে প্রতি বছর ছুটির পর বোলপুরে নেমে ওই নীল বাস আর নীলমণিদাকে দেখলেই মনে হত এতদিন পর ঠিক জায়গায় ঠিক লোকের কাছে এসে গেছি। নীলমণিদা ছোট্ট বোলপুর শহর ছাড়িয়ে আমাদের নিয়ে এলেন ভুবনডাঙার এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায়। তখন সিনেমা হাউস পেট্রোল পাম্প এত পাকা বাড়ি কোথায়? কোথায় পিচ রাস্তা? সে তো হল অনেক পরে ১৯৪৯ সালে, আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের সময়। দু'ধারে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে লাল কাঁকরের এক ফালি রাস্তা— কাব্যি করে বলা যেতে পারে 'রাঙামাটির পথ'। কিন্তু অনেক সময় খানাখন্দে ভরা ওই রাঙামাটির পথ এড়াতে নীলমণিদার ঝরঝরে নীল বাস মাঠ বরাবর চলত শান্তিনিকেতনের দিকে। খানিক রাস্তা খানিক মাঠ—এইভাবে নিচু বাংলা এলাকা পেরিয়ে, তখনকার শিক্ষাভবন হস্টেলের গা ঘেঁসে এগিয়ে, পান্থনিবাসের কাছে বাঁয়ে মোড় নিয়ে, আবার বাঁয়ে ঘুরে যে

বাড়িটার সামনে এসে বাস দাঁড়াল, সেটাই তখন গেস্ট হাউস। গোড়ায় এই বাড়ির নামই ছিল শান্তিনিকেতন। মহর্ষির তৈরি। এই আদি বাড়ির নামেই পরে জায়গার নাম, বিশ্বখ্যাতি।

গেস্ট হাউসের সামনে একটা অদ্ভুতদর্শন মূর্তি দেখে একটু দমে গেলাম। এমনিতে মন্দ লাগছিল না। ওপাশে রঙিন কাচের বাড়ি আমলকি কানন পাখির ডাক, সামনে বড় ফটকের উপরে লেখা—আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি। পেছনে আম্রকুঞ্জ শালবীথি, কিন্তু মূর্তিটা যেন অন্য রকম। পরে শুনেছি সব নবাগতের নাকি ওই রকম মনের অবস্থা হয়। আরও জানলাম ওটা রামকিঙ্কর বেইজের তৈরি একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট মূর্তি—যার আনঅফিসিয়াল নাম গেস্টতাড়ুয়া।

ভর্তির পাট চুকিয়ে মা-বাবা চলে গেলেন কলকাতায়, আর আমি পরম শান্তিতে আশ্রয় নিলাম স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং পরে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা শান্তিনিকেতনে—যেখানে আমার জন্মান্তর ঘটল। পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।

আমি স্থান পেলাম শিক্ষাভবন ছাত্রাবাসে। এখন যেখানে মেয়েদের নতুন হস্টেল—মৃণালিনী—ঠিক সেইখানে। তখন ছিল চারটি ব্লক, দ্বারিক, নবকুঞ্জ, টগরের বেড়া আর গন্ধরাজের বাগানে বিশাল মনোরম জায়গা। হস্টেলের এলাকার সামনেই দোতলা দেহলি আর পাশে খড়ের তৈরি নতুন বাড়ি। এককালে ওইখানেই থাকতেন ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায়, উইলি পিয়ার্সন। সেকালের মাস্টারমশাইরা। পেছনে হিন্দীভবন, এপাশে বোলপুরের রাস্তা, ওপাশে শিশুবিভাগ 'সন্তোষালয়। হস্টেল থেকে দু'পা এগোলেই আমাদের ক্লাসের জায়গা। গাছতলায় চার পাঁচটা বেদী—আর কাঁকরছাওয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি বসার জায়গা। বেদী অধ্যাপকের, কাঁকর মাটি ছাত্রদের। শ্রীনিকেতনের তৈরি মোটা আসন পেতে আমরা বসতাম। একটি ক্লাস ছিল মহুয়া 'গাছের তলায়। বসন্তকালে পাকা টুসটুস মহুয়া পড়ত ক্লাসে আর আমরা

লেকচার শোনার ফাঁকে মুখে পুরতাম। বেলগাছের তলায় ক্লাস যখন বসত, দুশ্চিন্তায় থাকতাম, কখন মাথায় ঠাস্ করে পড়ে।

প্রথম দিন ক্লাসে গিয়েই ঠিক করে নিলাম, হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এর চেয়ে ঢের ভাল কলকাতার বঙ্গবাসী বা শিলচরের গুরুচরণ কলেজ। দশটা চারটা নয়, এখানে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা ক্লাস, তা'ও গাছের তলায়। একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে মেয়েরা। সব মিলিয়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ। আগে থেকেই এ সব অবশ্য কিছু কিছু জানি, কিন্তু কলেজ জীবনের প্রথম দিনের প্রথম পিরিয়ডে কী দরকার ছিল জেমস জিনসের 'দি ডায়িং সান' নামক দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ্য হিসাবে হাতে নেওয়ার? তাছাড়া ইংরেজির অধ্যাপক তো আরও অনেকে ছিলেন, কিন্তু কী এমন কারণ ঘটল যে ওই রচনাটি ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব দিতে হল ডঃ আলেক্স আরনসন নামে একজন বাঘা জারমান পণ্ডিতকে? একে অনভ্যস্ত পরিবেশ, তদুপরি এক ডজন অপরিচিতা এদিকে তাকিয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হল তাদের খুক খুক হাসির লক্ষ্য যেন বাঙালস্য বাঙাল আমিই। আমি যে প্রফেসরের জারমান উচ্চারণে ইংরেজি বাক্যাবলীর এক বর্ণও বুঝতে পারছি না, এই গোপন কথাটি যেন মেয়েরা টের পেয়ে গেছে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ক্লাস শেষ। আমার কম্প দিয়ে আসা জ্বর ঘম দিয়ে ছাড়ল। পরের ক্লাস ইতিহাসের। সায়ান্সের ছেলেমেয়েরা চলে গেল ল্যাবরেটরিতে, পুরানো কোআপ বাড়ির পাশে। আমরা যারা ইতিহাসের, চলে গেলাম বেল আর মহুয়া গাছের তলা থেকে চা-চক্রে—দিনেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে যার নাম দিনান্তিকা। এই চা-চক্রে রোজ বিকেলে চায়ের আসর বসত। আসতেন নন্দলাল বসু, তেজেশচন্দ্র সেন, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—আরও অনেকে। ওই আসরে কেরানি শিক্ষক সচিব সব সমান। ইতিহাসের ক্লাস নিলেন সুধীরচন্দ্র রায়—চিত্র পরিচালক বিমল রায়ের

দাদা। সে বছরই রিলিজ হয়েছিল 'উদয়ের পথে'। বিমল রায়ের আত্মীয় জেনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সুধীরদার দিকে। শান্তিনিকেতনে তখন তিন সুধীর—সুধীর রায়, সুধীর কর এবং সুধীর গুপ্ত। বোঝানোর জন্যে আমরা বলতাম সুধীর রায়দা, সুধীর করদা, সুধীর গুপ্তদা। সুধীর রায়দা শান্তশিষ্ট ভাল মানুষের মত পড়ালেন সকালবেলা, বিকেলবেলা দেখলাম ধুতি মালকোচা মেরে এই সুধীর রায়দাই রেফারি সেজে নেমে পড়েছেন ফুটবল মাঠে। দু'নম্বর রেফারি ছিলেন পাঠভবনে অঙ্কের শিক্ষক বিশ্বনাথদা। বিশ্বনাথ মুখার্জি।

আস্তে আস্তে আলাপ জমল নিজের ক্লাসের ও উপরের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। বন্ধুত্বের সেই সূত্রপাত এবং তার জের চলছে আজও। এগিয়ে এল মেয়েরাও। আমি চিত্রা দাশগুপ্ত, আমি অনিতা সেন, আমি মুকুল রায়, আমি সুসীমা দাশগুপ্তা, আমি সুনন্দা রায়, আমি নন্দিতা দাস। ছেলেরাও কাছে এল একে একে। নানা জায়গা থেকে এসেছে। সন্তোষ ব্যানার্জি শুভময় ঘোষ মহাদেব চট্টোপাধ্যায় কল্যাণ সেন সুবীর সেন সুনীল সেনগুপ্ত অজিত বিশ্বাস মকবুল রহমান অনিল সেনগুপ্ত ঈশ্বরলাল দেশাই নরসিংহভাই প্যাটেল সুনীল সরকার। তার মধ্যে যারা এখানকার স্কুল অর্থাৎ পাঠভবন থেকে পাশ করে আসা ছাত্র, তাদের দেমাক একটু বেশি। হবারই কথা। পুরোনো তো।

ইতিমধ্যে আমার নাম অমিতাভ থেকে অমিত হয়ে গেছে। ডঃ আরনসন. যিনি পরে ইজরায়েলের তেল আভিব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক.—স্বরান্ত অমিতাভ উচ্চারণ না করতে পেরে সংক্ষিপ্ত এবং হলন্ত অমিত নামটি চালু করেন। দাঁতভাঙা নামে অভ্যস্ত একজন জার্মান যে কী করে 'অমিতাভ নামক যুক্তাক্ষরবর্জিত একটি সরল শব্দে ভয় পেলেন, আজও বুঝতে পারি নি। যাই হোক, আমি ততক্ষণে কলেজ হস্টেলে কায়েম হয়ে গেছি। চারটি ব্লকের

বেসরকারী নাম প্রচণ্ড তাণ্ডব প্রলয় ভৈরব—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে চিত্রপরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। নামেই মালুম, হস্টেলের চালচলন কেমন ছিল। আমি ঠাঁই পেলাম প্রলয়ে। মাঝের ঘরে চার সীট। নোয়াখালির মোফাজ্জল, হায়দর চৌধুরী, ডেহরি অন সোনের বাসুদেব নারায়ণ, কোট্টায়ামের এস রাজন এবং সিলেটের আমি। এস রাজন প্রথম যেদিন এল, এল শুধু একটা পকেট ডিক্সনারি ও এক কৌটো কিউটিকিউরা পাউডার নিয়ে। জামাকাপড়ের বাক্স, বিছানাপত্র—কিছুই নেই। অবাক হলাম। কিন্তু ইংরেজি বলার ভয়ে কারণটা জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না। দুদিন পর বোলপুর থেকে সে সব কিনল। বাসুদেব বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা চলে এসেছে। তার জিনিসপত্রও যৎসামান্য। হায়দর ঢাকা থেকে এসে ভর্তি হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি অনার্সে। তখনকার প্রিন্সিপাল অপূর্বকুমার চন্দ তাকে পাঠিয়ে দেন শান্তিনিকেতনে। এখানে এসে সে থার্ড ইয়ারে বাংলা অনার্স নেয়। চারজনে বেশ ছিলাম। ধর্মভেদ ভাষাভেদ ভুলে ঐক্যে বাঁধার শিক্ষা আমার শুরু এই কলেজ হস্টেলেই।

দ্বিতীয় দিন সকালের ক্লাসে দোসরা দফার পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতেই সেকেণ্ড না ফোর্থ ইয়ারের একজন ছাত্রী চেঁচিয়ে বললেন,—"অ্যাই, আজ আর ক্লাস হবে না। অনিলদা পারমিশান দিয়েছেন আউটিংয়ে যাবার। চল কোপাই।" কোপাই মানে কোপাই নদী এবং অনিলদা মানে কলেজের প্রিন্সিপাল অনিলকুমার চন্দ। আমি ভাবছি, এ আবার কোন্ ধরনের প্রিন্সিপাল, আকাশে মেঘ ডাকলেই ছুটি দেয়। তা যাই হোক, চার ইয়ারের জনা সত্তর ছাত্রছাত্রী মিলে পাড়ি দিলাম কোপাই নদীর পথে। সঙ্গে অর্থনীতির অধ্যাপক খগেন ভট্টাচার্য—যাঁর 'যুগের যাত্রী' নামে একখানা উপন্যাস তখনই বেরিয়েছে—এবং ইংরেজির অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকার—যিনি 'জামতলা' নামক একটি

কবিতা লিখেই অমরত্বের দাবি করতে পারেন। সুনীলদা ভাল গান লিখতেন, গানও রেকর্ড করেছেন। তাছাড়া নাটকও লিখেছেন দু তিন খানা। ছোটদের 'কালোর বই' তো দুর্দান্ত মজার বই।

খানিক এগোতেই নামল বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। তার সঙ্গে গান। শালের বনে থেকে থেকে, ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে মাঠের পরে—এই পঙক্তিটি কত বাস্তব সেদিনই ধরা পড়ল আমার চোখে। গানে আর বৃষ্টিতে তখন গলাগলি। চুল ভিজছে মন ভিজছে। আমি আর তখন আমাতে নেই। চেনাশোনার বাইরে যেখানে পথ নেই—সেই স্বপ্নের আল ধরে হেঁটে চলেছি। শরীর ধুয়ে দিচ্ছে বৃষ্টি, মন ধুয়ে দিচ্ছে গান। একজন প্রথম কলি ধরে তো দশজন পদ পূরণ করে। কেয়াফুলের মদির গন্ধ, কদমফুলের কেশর ছড়ানো পথ আর শ্রাবণের পবনে আকুল একদল তরুণ তরুণীর কলকাকলি আমাকে মুহূর্তে অন্য জগতে নিয়ে গেল। চণ্ডালিকার প্রকৃতির মত আমি মনে মনে বললাম, এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার। তারপর কোপাই। তার জলধারার কলস্বরের সঙ্গে মিলিত হল আমাদের আনন্দধারা।

ফিরে এলাম হস্টেলে। পায়ের জুতো-জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তক্তপোষের তলায়, মোটা ধুতি কেটে বানালাম ছোটো পাজামা, শিখে গেলাম পাজামার সঙ্গে পরতে হয় পাঞ্জাবি, গান বা কবিতা পাঠের পর হাততালির বদলে বলতে হয় সাধু সাধু, ছোটবেলার সেই রবি ঠাকুরকে ডাকতে শুরু করলাম গুরুদেব এবং সেই দিন থেকেই সেই মুখচোরা চাপা গ্রামের ছেলেটি আস্তে আস্তে পালটাতে লাগল, সে হল মুখর। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, চুয়াল্লিশকে আর চৌচল্লিশ না বললেও এ-কার অ্যাকারের তফাৎ সে এখনও বুঝল না। সে আজও বেং বলে, বলে ভ্যাক। তা হোক, শান্তিনিকেতন তাকে আশ্রয় দিল, এবং সেও ঠিক করল, অন্য কোথাও নয়, এইখানেই তার আগামী কালের আবাস।

২

আজকের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অবশ্য ১৯৪৪ সালের সেই শান্তিনিকেতনের বিশেষ মিল নেই। না চেহারায়, না চরিত্রে। মাঝের ওই কুড়ি বিঘা জমির আদি আশ্রম-এলাকা ছাড়া। গোটা পূর্ব পল্লী তখন ফাঁকা। রেল লাইনের ধারে হ্যারিকেন-জ্বালা মাত্র দুখানা বাড়ি। একখানা স্নেহলতা রায় ও মিলনানন্দ রায়ের 'পদছায়া'। তাঁদেরই ছেলে বিশ্বজিৎ আমার বন্ধু। দীর্ঘদিন মস্কোতে কাটিয়ে এখন অমৃতবাজার পত্রিকার এসিসট্যাণ্ট এডিটার। বিশ্বজিতের যেমন দৈর্ঘ্য, তেমন প্রস্থ। তারই প্রটোটাইপ আমাদের আর এক বন্ধু অভীন্দ্রনাথ ঠাকুর--মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাতির নাতি। এই দুই সুদীর্ঘ এবং সুবিশাল বপুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিকিমাউসের মত আমি যখন শালবীথি দিয়ে হাটতাম, মনে হত ইংরেজি 'এম' অক্ষর এগিয়ে চলেছে। বিশ্বজিৎ আমাদের বছরই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারল না জিওগ্রাফিতে ক্লে ছয় নম্বর পাওয়ার জন্যে। বেচারা হয়ে গেল এক বছর জুনিয়র। তবে আমিও যে কী করে ম্যাট্রিকে অঙ্কে পাশ করলাম, সেই রহস্য আজও উদ্ধার করতে পারিনি। অঙ্কে আমারও ছয় পাওয়ার বিদ্যে।

পূর্ব পল্লার অন্য বাড়ির মালিক ছিলেন সুকুমার দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী নিরুপমা—কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের বোন, আমাদের স্নেহময়ী মাসীমা। তাঁদেরই মেয়ে চিত্রা—এখন পালচৌধুরী—আমার সহপাঠিনী বান্ধবী। কত সুখের দিন কেটেছে বিশ্বজিৎ আর চিত্রার বাড়িতে। এখনও শান্তিনিকেতনে গেলে আমি ফাঁকা বিশাল মাঠের মাঝখানে শুধু ওই বাড়ি দুটিই দেখতে পাই। দুই চোখে দুটি হ্যারিকেন জ্বলে।

এপাশে ডাকঘরের পিছনটায় পিয়ার্সন হাসপাতাল। সেখানে বড় ডাক্তারবাবু শচীন মুখার্জি—যিনি সব সময় বাঙাল কথা বলেন। মালকোচামারা ধুতি, পাঞ্জাবি, মাথায় সোলার হ্যাট, গলায় স্টেথোস্কোপ, বাহন সাইকেল এবং মুখে গুনগুন কীর্তন। এই ডাক্তারবাবুর উৎসাহেই বহু আগে বাঙাল-সভা নামে একটা সমিতি করা হয়েছিল। ঠিক হয় সভার কাজকর্ম গান বক্তৃতা ইত্যাদি বাঙাল ভাষাতেই হবে। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করা হয়। যেহেতু তাঁর আদি বাড়ি শ্বশুর বাড়ি মামা বাড়ি—সব যশোর-খুলনায়। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেন, 'মুগির ডাল' আর 'কুলির অম্বল' এই দুটি শব্দ সম্বল করে বাঙাল ভাষায় সভাপতির ভাষণ দেওয়া যায় না। ছোট ডাক্তার বৈদ্যনাথবাবু এবং কম্পাউণ্ডার যাদবদা—যিনি ওষুধ চাইলে অ্যালোপ্যাথির অপকারিতা বুঝিয়ে নিজের তৈরি পাচন খেতে বলতেন। তখন নার্স টার্সের বালাই ছিল না। ভোলাদা রান্না করে রোগীর খাবার দিতেন, বিছানা পাততেন, যন্ত্রণায় উঃ আঃ করলে কাছে বসে বাতাস করতেন। তাকে সাহায্য করত ছেলে অনিল। এই হাসপাতালে বার দুই আমি ছিলাম। ভালই ছিলাম। সকাল বিকাল বন্ধুরা দেখতে আসত, গল্প করত, বিনা ওষুধেই অসুখ সেরে যেত। তাছাড়া তখন নিয়ম ছিল কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে পালা করে ছাত্রদেরই সেবা করতে হবে। বীরেন পালিতদা এবং গোঁসাইজি—মানে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর যখন টাইফয়েড হল, অনেকদিন আমাদের রাত জাগতে হয়েছিল শুশ্রূষার দায়িত্ব নিয়ে।

হাসপাতালের গায়ের বাড়ি অজয়াদ্রি। লতিকা রায় ও পূর্ণেন্দু রায়ের। তাঁদের ছেলে অজেয় এখন নামকরা শিশুসাহিত্যিক। তারপর মুকুল দে আর সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর বাড়ি। সুধাকান্তদা ছিলেন কবির সচিব। তার মাথায় টাকের জন্য রবীন্দ্রনাথ ডাকতেন 'বালডুইন'। প্রমথনাথ বিশীর ভাষ্য অনুযায়ী এই সুধাকান্তদাই মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসেবে সদ্যোধৃত একটি বাঘের মাংস খেতে

চেয়েছিলেন। বাঘ মানুষ খায়, অন্তত একজন মানুষ বাঘ খেয়ে শোধ তুলুক—এই নাকি ছিল তাঁর বাসনা। মুকুলদা তখনই আর্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। সঙ্গে স্ত্রী বীণা ও মেয়ে মঞ্জরী। প্রতিভাবান বলেই মুকুলদা কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত. অনেকে তাঁকে ভয়ও পেত। একবার তিনি একটি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'কলিতা'। দারুন সাজানো গোছানো। মুকুলদা আমাকে দিয়ে তাঁর দোকানের একটি ছড়া লিখিয়ে নিয়েছিলেন—'চোখ ও পেটের ক্ষুধা দূর করে কলিতা, রুচিহীন এই দেশে শিবরাত্রি সলিতা।' ছড়াটিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ওই 'রুচিহীন এই দেশে' কথাটার জন্যে। পরে তাকে আমি বলি, রুচিহীন বলতে আমি শান্তিনিকেতন বুঝাইনি, বুঝিয়েছি অন্য সব জায়গা। যাই হোক, মুকুলদা নিজেই ছিলেন তার দোকানের বাজার সরকার কুক ও বেয়ারা। কিন্তু ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে গেলো। দুবেলা ট্যাক্সি করে বোলপুরে বাজার করতে গেলে দোকান টেঁকে কখনও? কাছাকাছি আরও তিনটি বাড়ি। সন্তোষ মজুমদারের স্ত্রী শৈলদেবীর, গৌরগোপাল ঘোষের স্ত্রী বুড়িদির এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার বোন নীলিমা বড়ুয়ার। নীলিমা ছিলেন কলা ভবনের ছাত্রী। জ্যান্ত সাপের গয়না পরতেন গায়ে। হেলের কাঁকন, ঢোঁড়ার চন্দ্রহার। গাল গল্প নয়, নিজের চোখে দেখা।

এখন যেখানে সেবা পল্লী, সেখানে ছিল বিরাট জামবাগান। কোন নাটকে গাছপালার দরকার হলে আমরা দা-হাতে রাত্রে জামবাগানে ঢুকে পড়তাম। বিশেষ করে ভুশণ্ডির মাঠে যত বার অভিনীত হয়েছে, ততবারই ওই জামবাগানের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। জামগাছগুলি কেটে দেওয়ার পর আমরা অবশ্য আফশোস করেছি। রতনপল্লী, অবনপল্লী ইত্যাদির তখন লেশমাত্র ছিল না। কেবল খোয়াই আর খোয়াই। এখনকার রতন পল্লীর কাছাকাছি ছিল একটি মাত্র বাড়ি—

থাকতেন বড় ডাক্তারবাবু। আর ছিল সুরপুরী এবং ভি আই পি গেস্ট হাউস রতনকুঠি। সুরপুরী ছিল দিনেন্দ্রনাথের বাড়ি। বিলিতি ধরনের নিঃসঙ্গ-নিকেতন। রতনকুঠি অর্থাৎ টাটা বিল্ডিংয়ের মত অমন সুন্দর বাড়ি কদাচৎ দেখা যায়। যেন একখানা ছবি। আর তার অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকার এমনই যে. গরমের দেশ শান্তিনিকেতনে বোর্ডাররা যদি রাত্রে সস্ত্রীক বাইরে বারান্দায় শুতে চান, তাহলেও কারও আব্রু নষ্ট হয় না। তখন অতিথি আসতেন তো কম, তাই দু-তিনজন ওখানে থাকতেন পাকাপাকি। প্রথমে শশাঙ্কদা নামে আমাদের এক ইতিহাসের অধ্যাপক থাকতেন. তারপর দীর্ঘদিন ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক শিশিরদা---ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ। সুপণ্ডিত. সুবেশ, চিরকুমার। মার্জরি সাইকসও থাকতেন। তবে আমাদের বেশি আকর্ষণ করতেন রতি পেটিট নামে এক পারশি মহিলা। তিনি কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতেন, আর দুপুরে ইংরেজি বাজনার রেকর্ড চালিয়ে বন্ধ ঘরে একা আপন মনে নাচতেন। আমরা জানালার ফাঁক দিয়ে নাচ দেখার চেষ্টা করতাম। এই রতি পেটিটের নাম এখন লী গৌতমী—লামা অনাগরিক গোবিন্দের স্ত্রী—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। রতনকুঠির রাঁধুনি ছিল পঞ্চা। সে নাকি সেকালের এক ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের নাতি। পঞ্চা ভাল মুরগি রাঁধত। ধানের দানা ছড়িয়ে ছড়িয়ে কোন বাড়ির প্রলুব্ধ মুরগিকে দূরে নিয়ে এসে লুকিয়ে সমর্পণ করা হ'ত পঞ্চার কাছে এবং রাত্রের অন্ধকারে টাটা বিল্ডিংয়ের পিছনের বাগানে বসে আমরা যখন ঠ্যাং চিবোচ্ছি. তখন সদ্যো-পরলোকগত কুক্কুট শাবকের শোকে গৃহস্থ বাড়িতে হায় হায় রব উঠেছে। টাটা বিল্ডিংয়ে পরে কিছুদিন ছিল দীনবন্ধু ভবন। ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মার্জরি সাইকস। পরে হন ইংরাজির অধ্যাপক এস কে জর্জ। শান্তশিষ্ট পণ্ডিত মানুষ। শান্তিনিকেতনে এন সি সি অর্থাৎ সামরিক শিক্ষা চালু হওয়ার প্রতিবাদে তিনি ১৯৪৯/৫০ সাল নাগাদ চাকরি ছেড়ে চলে যান। এন সি সি অবশ্য পুরোদমে চলেছে।

পূর্বপল্লীতে তাদের নতুন বাড়ির নাম ক্ষিতিমোহন সেন দেন 'কুমার সদন'।

টাটা বিল্ডিংয়ের পিছনে ছিল পাঁচটি বাড়ি—তিনটি পাকা, দুটি খড়ের। পাকাবাড়িতে থাকতেন ব্রজকান্ত গুহ শিবদাস রায় ও সুধীন ঘোষ। আর পাকা বাড়ির অনেক পিছনে খোয়াইয়ের গায়ে ছিল দুটি খোড়ো বাড়ি। একটি বাড়ি কিনে অনেক পরে সেখানে থাকেন হৃষীকেশ চন্দ। অন্য খড়ের বাড়ি শঙ্খ চৌধুরীর। পরে রামকিঙ্কর বেইজ থাকতেন। তারও অনেক দূরে তালগাছে ঘেরা শ্মশানের কাছাকাছি ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকতেন শিল্পী কিরণ সিংহ। বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি কথা বলতেন কদাচিৎ, বেরোতেন কদাচিৎ। শুধু হঠাৎ হঠাৎ লম্বা রঙীন জোব্বা পরে দ্রুত পায়ে হেঁটে বোলপুর বাজারে যেতেন, পেছনে ছুটতেন তাঁর শাড়িপরা মেম বউ। ১৯৮১ সালে ইন্দিরা গান্ধী হঠাৎ ওই বাড়িতে হাজির হয়ে প্রায় বিস্মৃত কিরণ সিংহকে আবার পরিচিত করে তোলেন। শ্মশানের কাছে পরে একখানা বাড়ি তোলেন আমাদের বন্ধু মনোজিৎ দে'র বিজ্ঞানী বাবা ডঃ দে। আমরা ভাবতাম এত দূরে কেউ বাড়ি বানায়? আর এখন' এ বাড়িতো শান্তিনিকেতনের ডাউনটাউন।

এদিকে উত্তরায়ণ বাদ দিলে ছিল আওয়াগড়ের রাজার বাড়ি। চারদিকে এত আলো হাওয়া, যার জন্যে বুদ্ধদেব বসু নাম দিয়েছিলেন হাওয়াগড়। ওটা ছিল বিশ্বভারতীর আচার্যের জন্যে নির্দিষ্ট। দূরে খোয়াই আর ঢ্যাঙা তাল গাছের সারির কাছাকাছি এক কোণে আর একটা বাড়িতে থাকতেন ওমর খৈয়ামের সেই বিখ্যাত অনুবাদক কান্তিচন্দ্র ঘোষ এবং তার হাঙ্গেরিয়ান স্ত্রী এটা ঘোষ। ধুতি পাজামা অধ্যুষিত সেকালের শান্তিনিকেতনে শুধু কান্তিদাই প্যান্টশার্ট পরতেন। মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট, লাঠি ঠক ঠক বেড়াতে বেরোতেন বিকেলে খুব মিশুকে ছিলেন তিনি। অবশ্য তার চেয়ে বেশি মিশুকে ছিলেন এটাদি। রুচিশীলা, স্নেহশীলা, পরোপকারী।

উত্তরায়ণের ভেতরে উদীচী বাড়ি খালিই ছিল। পুনশ্চতে থাকতেন প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরা দেবী। শ্যামলীতে পরে এলেন বুবুদিরা—সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী পুত্র কন্যা —সুপ্রিয় মৈত্রেয় সুপূর্ণা ঈশিতা। কোণার্কে অনিল চন্দ, রাণী চন্দ ও অভিজিৎ। উদয়নে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী। মালঞ্চে কবি-কন্যা মীরা দেবী এবং নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালনী। নন্দিনী অর্থাৎ পুপেও তখন রথীদার সঙ্গে উদয়নে। উত্তরায়ণের সামনে পিছনে বাগান, লতানো আম ও পেয়ারা গাছ, জাপানী লেক। নয়নাভিরাম বাগানে ছিল ময়ূর ও সারস আর দেশি বিদেশী সব রকমের গাছপালা ফুল ফল। উদয়ন বাড়ির স্থাপত্য দেখবার মত। অন্য বাড়িগুলিও বিশিষ্ট। আর রথীন্দ্রনাথের গুহাগৃহ যেন স্বপ্নের বাড়ি। চারদিকে ফুলের বাহার। চন্দন শিমুল মুচকুন্দ পলাশ থাকলে যেন উজ্জয়িনীর উদ্যান। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বড় শিল্পী ছিলেন এই অপ্রতিম উদ্যান দেখলেই টের পাওয়া যায়। উত্তরায়ণ দৈত্যের বাগান ছিল না —সেখানে আমাদের ছিল অবাধ প্রবেশ। একা আপন মনে ঘুরে সময় কেটে যেত। সামনে ছিল গোলাপ বাগান। শ্যামলীর পাশে কাঠ গোলাপ, কোণার্কের গায়ে নীলমণিলতা আর বিরাট শিমুল গাছ। ফুলের গন্ধে আর রঙে মনে হত, বাকি জীবনটা এখানেই দেখে দেখেই কাটিয়ে দিই।

একেবারে পশ্চিমে যে বাড়ির নাম প্রান্তিক, সেখানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। সবাই বলত মামাবাবুর বাড়ি। সেকালে ওটাই ছিল শেষ প্রান্তে। তাই প্রান্তিক। তার আগে খড়ের বাড়ি বাসবী—থাকতেন সেবকদা আর নন্দলাল-দুহিতা যমুনা সেন। তিনি ভাল নাচতেন এককালে। তাঁরই দিদি গৌরী নটীর পূজায় নটী সেজে নেচেছিলেন কলকাতার মঞ্চে। ১৯২৫ সালে। ভদ্রঘরের মেয়ের মঞ্চে নাচা সেই প্রথম। আর একজন অবশ্য তারও আগে মঞ্চে নেচে "বদনাম" কুড়িয়েছিলেন। তিনি সাগর-নৃত্য-খ্যাত

রেবা রায়—রবীন্দ্রনাথ যাঁকে রক্তকরবীর অভিনয়ে নন্দিনী চরিত্রের জন্য মনোনীত করেছিলেন।

শ্রীনিকেতনে যাবার পথে রামকিঙ্করের কিছু ভাস্কর্য—হাটের পথে সেই বিখ্যাত সাঁওতাল পরিবার। কাপড় শুকোতে শুকোতে বাড়ি ফেরার মূর্তি তৈরি তিনি করেন অনেক পরে। আমাদের চোখের সামনে। দুপুর রোদে টোকা মাথায় খাকি হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে কিঙ্করদার ভাস্কররূপ তাঁর ভাস্কর্যের চেয়ে কম আকর্ষক নয়। সংগীত ভবন প্রাঙ্গণে জয়া আপ্পাস্বামীর আদলে সুজাতা, কলাভবন প্রাঙ্গণে গান্ধীজি ও আর কিছু মূর্তি শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিকে করেছে আরও মনোহর। শ্রীভবনের লাগোয়া বর্তমান বুদ্ধমূর্তিও কিঙ্করদার। আগে ওখানেই ছিল রুদ্রাপ্পায়জির তৈরি মূর্তি। তার পরেই কালীমোহন ঘোষের বাড়ি। তিনি তখন নেই। আছেন শান্তিদেব ঘোষ, তাঁর মা ও ভাইবোনেরা। শান্তিদার স্ত্রী, বড়বৌদি আমার মত অনাত্মীয়কেও আপন করে নিয়েছিলেন। শান্তিদার সবচেয়ে ছোটভাই শুভময় অর্থাৎ ভুলুর সুবাদে আমি তাদের বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিলাম। বহুদিন ওখানেই খাওয়াদাওয়া শোয়াবসা। ওদের বাড়িতে দারুণ ফিশ খেলা হত। চার প্যাকেট তাস নিয়ে পনেরো-ষোলজনের খেলা। তাতে দারুণ উত্তেজনা। হিসেব রাখার জন্যে নেপালচন্দ্র রায়ের নাতি সুব্রত অর্থাৎ ভেলটু কেরানির কাজ করত। বড়বৌদি খুব জিততেন, কিন্তু শান্তিদা ভীষণ হারতেন বলে জিতেও তাঁর সুখ ছিল না।

ওরা ছ'ভাই আর একবোন একসঙ্গে মিললে সে এক মহোৎসব শুরু হয়ে যেত। শান্তিদা পড়ছেন লিখছেন গান গাইছেন সাইকেলে বোলপুর ঘুরে আসছেন আর মাঝে মাঝে গল্পেও যোগ দিচ্ছেন। সাগরদা অর্থাৎ সাগরময় ঘোষ এমনিতে চুপচাপ, শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা রসিকতা। সাগরদার গানের গলা সুন্দর, কিন্তু হঠাৎ গান গাওয়া ছেড়ে দিলেন। সমীরদা আড্ডায় কদাচিৎ যোগ দিতেন, তবে

মজার মজার মন্তব্য ছুঁড়ে দিতেন দূর থেকে। সলিলদা থাকতেন বম্বেতে, তখন কাজ করেন নেভীতে। হঠাৎ হঠাৎ এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দিতেন। বড় ছটফটে স্বভাব, তবে নানা বিষয়ে দারুণ উৎসাহ। সলিলদা আবার ঘন ঘন মত বদলাতেন। একবার এসে বললেন, "বুঝলে, বম্বেতে মারাঠীরাই হচ্ছে আসল। গুজরাতীরা কিছুই না।" পরের বার সলিলদা এলে আমি তাঁকে খুশি করতে মারাঠীদের একটু প্রশংসা করামাত্র আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, "আরে দূর দূর, মারাঠীরা থার্ড ক্লাস, অনেকটা আমাদের বাঙালীদের মতন। গুজরাতীদের তুলনা হয় না।" অবশ্যি সলিলদার টান যে মারাঠীদের দিকেই বেশি ছিল, তার প্রমাণ পেলাম অনেক বছর পর। গুজরাতী নয়, তিনি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন এক মারাঠী মহিলাকেই। ঘোষ-বাড়ীর আড্ডায় মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আসত ওদের ভাগনে শম্ভু —কবি দীপক মজুমদার। আমাদের কাজ ছিল ওর পেছনে লাগা। সুবীরময় অর্থাৎ মণ্টুদা বরাবর হাজির জবাবে ওস্তাদ। ঠোঁটের ডগায় লাগসই কথা লেগে আছে। তিনি যেখানে, আড্ডা সেখানে জমজমাট। অভিনয়েও তিনি ছিলেন নিপুণ। কনিষ্ঠ শুভময় ছিল সেরা—গানে, আবৃত্তিতে, চলনে বলনে প্রকৃত আশ্রম বালক। তার অকাল মৃত্যুর শোক আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ভুলুর ছেলে কুকুল এখন মস্ত জোয়ান। সেই চলা, সেই বলা—ওকে দেখলে ভুলু বলেই ভুল করি।

শান্তিদাদের একমাত্র বোন বুড়িদি—সুজাতা মিত্র—ভাল নাচিয়ে। শ্যামা চিত্রাঙ্গদায় বহু অভিনয় করেছেন। তার মেয়ে আঁখিও চমৎকার নাচে। এই সেদিন তাসের দেশ নাটকে বুড়িদি, আঁখি ও তার মেয়ে কুঁড়ি—তিন পুরুষ একসঙ্গে নাচলেন রবীন্দ্রসদনে। অমলাদি অর্থাৎ অমলা সরকার—তখন বসু—ভুলুদের মাসি। তিনি সে সময় গান শেখান পাঠভবনে। মনোহর গানের গলা ছিল তাঁর। আর কারুশিল্পে তো তিনি নামজাদাই। অমলাদিও থাকতেন ভুলুদের বাড়িতে, আড্ডায় যোগ দিতেন।

এ বাড়ির কথা বলতে গিয়ে মাসিমা—মনোরমা ঘোষের কথা না বললে সব অপূর্ণ থাকে। সারাদিন বাড়ির কাজে ব্যস্ত। কাজের লোক আছে, তবু উঠোন সাফ বাসন মাজা ছাড়েন নি। সেই কবে থেকে আশ্রমে আছেন, কিন্তু বাঙাল কথাও ছাড়েন নি। একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৫৫ সালে আমি আর ভুলু চৈতীর পেছনে বসে আছি। হঠাৎ একজন রোগামতন অল্পবয়সী সাহেব এসে মিসেস ক্যালীমোহান গোশের বাড়ি কোথায় জানতে চাইল। ভুলু বলল, "আমি কালীমোহন ঘোষের ছেলে। কী ব্যাপার?" ব্যাপার কিছুই নয়, তার নাম ওমরখৈয়ম পাউণ্ড, কবি এজরা পাউণ্ডের ছেলে। ভারতে যাচ্ছে শুনে তাঁর বাবা বলে দিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর বন্ধু কালীমোহন ঘোষের স্ত্রীর সঙ্গে যেন দেখা করে। ভুলু সানন্দে পাউণ্ড তনয়কে নিয়ে গেল বাড়িতে এবং মাকে ডাকল সামনে এসে কথা বলতে। মাসিমা তখন পেছনের উঠোনে কাঁঠালপাতা সাফ করছিলেন। ডাক শুনে এসে এবং সাহেব দেখে এক হাত লম্বা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেটি অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। মাসিমা পরে বললেন, "হ, উনার কাছে পাউণ্ডের নাম শুনছি।"

শান্তিদাদের বাড়ির পর সার সার বাড়ি—নন্দলালের স্ত্রী সুধীরা দেবী, সন্তোষ ভঞ্জদা—গৌরীদি, নন্দলাল বসু, মমতা দাশগুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষ মিত্রমশাইয়ের বাড়ি। নেপাল রায়মশাইয়ের ছেলে কালীপদদার নখদর্পণে ছিল পুরোনো শান্তিনিকেতনের সব নাম ধাম সাল তারিখ। এই সাল তারিখ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলত অজিনদা—অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১২ সেপ্টেম্বর না ১৩ সেপ্টেম্বর—তাই নিয়ে তুমুল তর্ক। অজিনদা ও তাঁর স্ত্রী অমিতাদি—অমিতা ঠাকুর, মেয়ে স্মিতাকে নিয়ে প্রায়ই আসতেন। অজিনদা নানা বয়সীর সঙ্গে মিশতে পারতেন। মজার মজার গল্প চৌটস্থ। অভিনয়ও করতেন ভাল। অমিতাদির অভিনয়

তো ঐতিহাসিক। তপতীতে ছিলেন মহিষী। ভাল লিখতেনও। সন্তোষ মিত্র আশ্চর্য লোক। নাম করা শিল্পী ছিলেন। বাজি ধরে অবনীন্দ্রনাথ ও তিনি একই ছবি এঁকেছেন। তাঁর ছবিই বাজি জিতেছিল। অভিনয়ে ছিলেন সেরা। বিলেতেও গেছেন এলমহার্স্ট সাহেবের পাল্লায় পড়ে। অথচ আমরা তাঁকে দেখেছি, দড়িপাকানো শরীরে খালিগায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে গরু চরাচ্ছেন বা মাটি কোপাচ্ছেন। সত্যজিৎ রায় অশনি সংকেত সিনেমায় তাঁকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন। মঞ্জু ও অমর্ত্যর বাবা-মা আশুতোষ সেন ও অমিতা সেনের বাড়ি হয় পরে। মমতা-অমিতা ক্ষিতিমোহন বাবুর দুই কন্যা। মমতা দাশগুপ্তা লাবু নামেই বেশি পরিচিতা। রবীন্দ্রনাথ আদর করে ডাকতেন পুষ্পলাবী। ভাল অভিনয় করতেন। অমিতা সেন তাদের শৈশবের শান্তিনিকেতন নিয়ে একখানা অসাধারণ বই লিখেছেন। উল্টো দিকে খোয়াই-রোধী লালবাঁধ ও এক্স-স্টুডেন্টদের বাড়ি প্রাক্তনী। লালবাঁধের গায়ে আর একগুচ্ছ বাড়ি এবং ওদিকে শ্রীনিকেতনের পথে শেষ বাড়ি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের হেমশ্রী। হেমশ্রীর উল্টো দিকে সাঁওতালপাড়া পিয়ার্সন পল্লী। ধীরুদা ও তাঁর স্ত্রী আতিথেয়তার জন্যে ছিলেন বিখ্যাত। আরও অনেকের মত বিনুদি বা মাসিমার হাতের সেই সুমধুর রান্না আমারও জুটেছে অজস্রবার। দীপেন-মঞ্জুলা-অতীন্দ্র—তিন সন্তান নিয়ে তাদের ছিল সুখী পরিবার। এখন ওই বাড়ি খাঁ খাঁ করে। এখন বোলপুর-শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন বাড়িতে বাড়িতে একাকার। আগে তা ছিল না। শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের মাঝখানে বিনয় ভবন হল ১৯৪৮-৪৯ সালে। চিপ সাহেবের কুঠির জঙ্গল সাফ করে পল্লীশিক্ষাসদনাদি হল তারও পরে এবং পিয়ার্সন পল্লীর পাশে বল্লভপুরের মৃগদাব তো একেবারে হালের।

সংগীত ভবনের কাছে পড়-পড় এক খড়োবাড়িতে থাকতেন কিঙ্করদা—রামকিঙ্কর বেইজ। আগে ছিল এক মেথরের ঘর।

কিঙ্করদা ওখানেই আসর জমিয়ে আড্ডা দিতেন, চেঁচিয়ে গান গাইতেন। তার কাছে টিনের চালের বাড়িতে বালকৃষ্ণ মেনন এবং তার গায়ের বাড়ি ধীরানন্দ রায়ের। ধীরাদার স্ত্রী নিপ্পননন্দিনী। কিন্তু পুরো বাঙালী। সুরেন্দ্রনাথ করের বাড়ি তারপর এবং একটু কাছেই এক শিখ পরিবারের বাড়ি। হরি সিং মদনের। তাঁর ছেলেমেয়েরা সুদর্শনাদি গজেন্দ্র ব্রিজেন্দ্র অজিত শান্তিনিকেতনে পড়ত। চাল চলনে কথায় বার্তায় ওঁরা অবশ্য বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। খেলার মাঠের দক্ষিণে হাতিপুকুরের কাছে আর এক গুচ্ছ বাড়ি জগদানন্দ রায়ের নাতি অন্নদা রেণ্টুদা ও বিভূতি সিংহ মশাইয়ের এবং শ্রীভবনের ঠিক উল্টো দিকে খেলার মাঠের গায়ে বাড়ি বি এম সেন, ডি এম সেনের। খেলাধূলোর ব্যাপারে বি এম সেন অর্থাৎ বীরেনদা ছিলেন খুব উৎসাহী। সে সময় বাইরে থেকে যত ভাল দল ফুটবল খেলতে আসত, তার পিছনে থাকতেন বীরেনদা। তিনি এবং ধীরেনদা —দুজনেই খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। পরে একটু এগোলেই খড়ের বাড়ির সারি—গুরুপল্লী। প্রথম বাড়ি অজিতকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী লাবণ্যলেখার। বৃদ্ধ বয়সেও অসাধারণ রূপসী ছিলেন তিনি। গুরুপল্লীতে সে-সময় থাকতেন সুখময় শাস্ত্রী—চেহারা গোল বলে আড়ালে তাকে ডাকা হত গোল পণ্ডিত—, মোহরদির বাবা সত্যদার বাড়ি, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, ভুজঙ্গদা সুখময়দা (চট্টোপাধ্যায়) গোঁসাইজি, হরিবাবুর বাড়ি : হরিবাবু মানে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-- যিনি ৪০ বছরে একা লেখেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১৯৪৪ সালে তাঁর কাজ শেষ হয়। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা দেখতাম, পুরু লেন্সের চশমা পরে তিনি রোজ বিদ্যাভবনে বা লাইব্রেরিতে যাচ্ছেন আর বই ঘাঁটছেন। আশীর কোঠায় পৌঁছেও দিনে অন্তত একবার লাইব্রেরিতে যেতেন লাঠিতে ভর দিয়ে।

সামনে ছোট্ট মাঠ পেরিয়ে টেনিস লন এবং চীনভবন। সেখানে চীনেপাড়া। থাকেন তান সাহেব, ফা চু, শু লু, উ য়েই। ওদিকে

নিচু বাংলো ঘিরে আর এক গুচ্ছ বাড়ি। হীরেনদা শৈলেশ চক্রবর্তীদা নগেনদা সুজিতদা শৈলজাদারা থাকতেন। নগেন্দ্রনাথ আইচ,—সেকালের এক শিক্ষকও থাকতেন ওই পাড়ায়। ধান খেতের গায়ে এক বাড়িতে থাকতেন প্রবাসজীবনবাবুরা। শেষ প্রান্তের বাড়ি দিগন্তিকা, বাচ্চু অর্থাৎ নীলিমা থাকত ওই বাড়িতে। তার পরেই অপূর্ব ঘোষের বাড়ি। টেনিস মাঠের চাতালে রোজ বিকালে আসতেন কম্ফটার গলায় এবং মোজা পরে তিন বৃদ্ধ। আমি বলতাম, ওই দ্যাখ্, ১৯৯৯ সালে বিশ্বজিৎ শুভময় ও অমিতাভবাবু বসে আছেন।

হিন্দীভবনের একপাশে পণ্ডিতজী—হজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, অন্য পাশে বিভূতি গুপ্ত। সুনীলচন্দ্র সরকার থাকতেন পেছনের এক ছোট্ট বাড়িতে,—সামনে জামগাছ, যাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন—আয় চলে এই জামতলায়, এদিকে জানলা, ওদিকে দোর, কেমন খেলনা বাড়িটা তোর, চলন্ত ছবি ঝলমলায়। সন্তোষালয় নামধারী শিশু বিভাগের লাগোয়া মুকুট বাড়িতে আবাস ছিল বাংলার অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাসের। বেণুকুঞ্জে থাকতেন তখনও অকৃতদার কয়েকজন অধ্যাপক—রণজিৎ মুখোপাধ্যায়, ধনপতি বাগ, ললিত মজুমদার। মন্দিরের পাশে একটি মাত্র তালগাছকে আশ্রয় করে তৈরি 'তালধ্বজ' বাড়িতে থাকতেন বৃক্ষবিলাসী তেজেশচন্দ্র সেন। ১৯০৮ সালে কিশোর বয়সে ঢাকা থেকে হঠাৎ চলে এসে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় চান এবং আশ্রয় পান। তেজেশদা পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি পরিচয় করাতেন। গানও নাকি গাইতেন ভাল। আমি শুনিনি।

কয়েকজন কর্মী, যেমন চিত্তরঞ্জন দেব, মেস করে থাকতেন মহুয়া-য়—এখন যেখানে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের অফিস। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে গান্ধীজি 'সংস্কার' নামে এক বাড়িতে ছিলেন। মন্দিরের কাছে পুকুরপাড়ের সেই বাড়িটি আর নেই। সেখানেও ছিল সস্তায় মেস। দেহলি এমনিতে খালি থাকত, বড়মা, মানে হেমলতা দেবী এলে থাকতেন। পাশে নতুন বাড়িতে এবং পেছনের পুরোনো

হাসপাতাল বাড়ি গৈরিকেও ছিলেন কয়েকজন কর্মী। থাকতেন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক বিহারী সিং ও গেস্ট হাউসের ম্যানেজার জগদীশ চট্টোপাধ্যায়। ডাকঘরের এপাশে ছিল গুর্জরী। কোন এককালে এক গুজরাতী পরিবার থাকতেন, তাই এই খড়ের বাড়ির নাম গুর্জরী। আমাদের সময় থাকতেন সুধীর রায়দা। ডাকঘরের ওপাশে প্রকাশন বিভাগের ছোট দোতলা,—থাকতেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছেলে অজিতদা—স্কুলে পড়াতেন ও হাঁপানিতে ভুগতেন। অকালে বিদায় নেন অজাতশত্রু অজিতদা।

এই হল মোটামুটি শান্তিনিকেতনের বিদ্যাপল্লী। সেই সঙ্গে পুরোনো আশ্রমের ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাখি। দ্বারিক আর দেহলির মাঝখানে বনপুলকের গন্ধ, বাসবীর কাছে কুরচির শুভ্রতা, চীনভবনের পাশে পলাশের লাল, পুরোনো লাইব্রেরীর গায়ে সেগুনতলা, মাধবী বিতান, পুরোনো ঘণ্টাতলার উপর বিরাট বটের ঝুরি, খেলার মাঠের গায়ে হিমঝুরি সোনাঝুরি ইউকেলিপটাস গাছের সারি, কলেজ হস্টেলের মুচকুন্দ শান্তিনিকেতনকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। শালের মঞ্জরী, আমের মুকুল, শিউলির মৃদুগন্ধ, হলদে পলাশের বাঁকা চাউনি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে মিশে শান্তিনিকেতন কখনও হয়ে গেছে কালিদাসের উজ্জয়িনী, কখনও পানিনির তক্ষশীলা। প্রধান প্রবেশ পথ ছিল হিন্দী ভবনের লাগোয়া ফটক। একটু এগোলেই কো-অপারেটিভ স্টোর্স, সামনে স্টেশনারি ও মুদির দোকান, পেছনে দোকান খাবারের। ডান দিকে বাঁক নিয়ে এগোলেই চৈতীর মোড়। নূতন কোনও শিল্পনিদর্শন সাধারণ্যে দেখানোর জন্যে বৌদ্ধরীতিতে তৈরি মাটির বাড়ি চৈত্য—চলতি নাম চৈতী। কো-অপারেটিভ স্টোর্সের সংক্ষিপ্ত নাম কোআপ। ওটাই তখন একমাত্র দোকান। খাতা পেনসিল চাল ডালের। তার পেছনের খাবার দোকানও প্রায় সবেধন নীলমণি। মিলত চা কফি পাঁউরুটি রসগোল্লা প্যারাকি। বহু বছর পর ওখানে খড়ের চালায় ঢেকে চারদিক খোলা একটি গোল জায়গা

করা হয়েছিল বসার। অর্থাৎ আমাদের আড্ডার নতুন জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল কোআপ। আমরা যেতাম, যেতেন মাস্টার-মশাইরা। ক্লাসের শেষে অমিয়দা হীরেনদার তো নিত্য যাতায়াত ছিল। আমরা কেউ কেউ অফ পিরিয়ডেও চলে আসতাম। লাইব্রেরী থেকে আসতেন মণ্টু রায়দা, চীনভবন থেকে বীরুদা, ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টেশন থেকে সাইকেলে ছুটে আসতেন মণ্টু ঘোষদা। এসেই কাঁধব্যাগ ফেলে একটা নতুন রসিকতা ছুঁড়ে দিতেন। কলাভবন থেকে এসে প্রশান্ত রায়দা হয়ত কোন গল্প তখন ফেঁদেছেন, মণ্টু ঘোষদা তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। ওদিকে সুধীর চন্দ ফিটফাট সেজে, গলায় চাদর জড়িয়ে এসে হাজির। প্রথম বাক্য—ভীষণ খিদে পেয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় আমাদের দায়িত্ব তাকে পেট পুরে খাওয়ানোর। খেয়েদেয়ে সে পেরুর জঙ্গলে মশার উপদ্রব বিষয়ে একখানা ঢাউস ইংরেজি বই পড়তে লেগে গেল। নারায়ণ চক্রবর্তীও—এখন বড় কোম্পানির বড় কর্তা—ছিল আর একজন ক্ষুধার্ত বালক। আলুথালু বেশে আড্ডায় বসে কাপের পর কাপ চা খেত। ওদিকে ভুলু আমাকে বাংলা পুঁথিশালা থেকে ইসারায় ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি ডেকে নিলাম সুগত বসু আর অনীশ ঘটককে। অনীশ এসেই গান ধরল। বরেন বাঁশিতে ফুঁ দিল। একদল ছাত্রী পরবী শিবানী শিপা আলো কাজল উমা এসেও যোগ দিয়েছে। একক গান হল কোরাস। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় ঠাকুর, সুকীর্তি করও চলে এসেছে। আড্ডা জমেছে। কিন্তু বিশ্বজিতের দেখা নেই। ঠিক যখন আমরা উঠব উঠব করছি, এমন সময় বিজয় ভবনের গায়ের ধানখেত ডিঙিয়ে বিশাল বপু বিশ্বজিতের আবির্ভাব। ওঠা হল না। আর এক দফা চা-সিঙ্গাড়া, আর এক দফা গান।

দুপুরে খাওয়ার ঘণ্টা বাজতেই সবাই ছুটল কিচেনে। আমরা ক'জন তখনও ক্যাটিগরি খেলে চলেছি। হঠাৎ কেউ বলল, 'হয়ে যাক এক হাত।' ব্যস, শুরু হয়ে গেল। আড্ডা শেষে হাঁটছি। হাঁটতে

হাঁটতে খেলা চলছে। এই ক্যাটিগরি খেলার ঠেলায় জেনারেল নলেজ ঝালিয়ে রাখতে হত সর্বক্ষণ। কখন কোন ক্যাটিগরির নাম পর পর বলে যেতে হবে আগে তো জানা থাকে না। যেমন একজন বলল বাউল, দ্বিতীয় জন বলল ক্রবাদুর। অর্থাৎ পর পর ভবঘুরে গাইয়েদের নাম বলে যেতে হবে। না পারলে আউট।

লেখাপড়ার ফাঁকে এই খেলা-গান-আড্ডায় আমাদের ছাত্র ও অধ্যাপক জীবনের নানা সময়ে অনেকে যোগ দিত। নানা বয়সের নানা জন। আগে অসমঞ্জ সেন, তপেন নিয়োগী, প্রণব ও প্রবীর গুহঠাকুরতা, বিভাস সেন, সুবীর সেন, সুবীর দাশগুপ্ত, সুনীল সেনগুপ্ত, সনৎ ব্যানার্জিরা যেমন ছিল, পরে তেমনি ছিল অজয় মহলানবিশ, প্রবুদ্ধ ঘোষ, অমর্ত্য সেন, মৃণাল দত্ত চৌধুরীরা। অজয় মহলানবিশ আজ প্রায় ত্রিশ বছর ডেনমার্কে। টেলিভিশনের একজন নামকরা প্রযোজক। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। একদম পাল্টায় নি। বাঙাল 'ইসে' মিশিয়ে দিনেমার ভাষা বলে—ইংরেজি ও বাংলার মত। প্রবুদ্ধ দিল্লীতে এক বিজ্ঞাপন কোম্পানি চালায়। শুনেছি ভাল চালায়। কিন্তু কী করে চালায় ভাবতে অবাক লাগে। ওর মাথায় তো দুষ্টুমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বিভাস সেনের অনেক গুণ ছিল। ছবি আঁকা, বাঁশি বাজানো, বাংলা লেখা—কিন্তু সব ছেড়েছুঁড়ে তিনিও এখন বিজ্ঞাপন সংস্থার বড়কর্তা। অমর্ত্য তো বিশ্ববিশ্রুত।

নানা বয়সের ও নানা সময়ের বন্ধু-পরিচয় একটু বিস্তারিত দিলাম। দিলাম এই কারণে যে, আড্ডা মেরেও কেউ লেখাপড়ায় কিন্তু ফাঁকি দেয়নি, সবাই ভালভাবে পাশ করে জীবনের নানা দিকে দাঁড়িয়ে গেছে। ভালভাবে পাশের কথায় মনে পড়ল সুধীর চন্দের কথা। নতুন কারও সঙ্গে পরিচয় করে দিতে গেলেই নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত জোড় করে বলত—'আমি সুধীর চন্দ, চারবার বি এ ফেল করেছি।' নতুন ভদ্রলোক অবাক হতেন, আমরা চটে যেতাম। বলতাম, 'এই

চারবার ফেল করার ব্যাপারটা এমন কী যে, ঘটা করে বলার দরকার।' সুধীর জবাব দিত—'আগে ভাগেই জানিয়ে রাখা ভাল।' সত্যিই সে চারবার ফেল করেছিল। তার কারণ পরীক্ষার সময় কোন গানের লাইন মনে না এলে তিনঘণ্টা ভাবতে ভাবতেই কাটাত এবং খালি খাতা দাখিল করে চলে আসত। এইভাবে চলেছে পর পর চারবার। অথচ সুধীর আমাদের অনেকের চেয়ে পড়াশোনায় ঢের ভাল ছিল। সুধীর এখন দিল্লিতে 'রবিগীতিকা' নামে গানের স্কুল খুলে নাম করেছে। নিজেও ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়।

অন্য কথায় ফিরে আসি। এখন যেখানে কালোর দোকান, তা হয় অনেক পরে। আগে কালোর ছোট্ট খাবার দোকান ছিল মেয়েদের হস্টেল শ্রীভবনের পিছনে—শুধু আবাসিক মেয়েদের জন্যে। বোলপুর যাওয়ার রাস্তার গায়ে ছিল যোগিনের দোকান। এখন যেখানে সেবাপল্লী, তার কাছে। সেই দোকানে শুধু চা নয়, ডাল ভাতও বিক্রি হত। বিনোদদা কিঙ্করদা বহুদিন ওখানে খেয়েছেন। দোকানটা উঠে যায় আমি ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরে। ঠিক তেমনি পঞ্চাশের দশকের শুরুতে বছর দুই চলার পর উঠে যায় হাসপাতালের কাছে মাই স্টোর্স নামে ডাল ভাত আর চা-কফির দোকান। চা এবং কফি মিলত কলেজ হস্টেলের নেবুকুঞ্জে আর হরিপদদার দোকানেও। সে কথায় পরে আসছি। আজকাল দেখছি অনেকে বোলপুর গিয়ে খেয়ে আসে। আমাদের সময় এ জিনিস ভাবাই যেত না। বোলপুরের সঙ্গে এমনিতেই যোগাযোগ ছিল কম। ছুটিতে আসা যাওয়ার সময় ছাড়া খেতে বা বেড়াতে যেতাম কদাচিৎ।

কো-আপের পর বেণুকুঞ্জ। এখানে খেলার দপ্তর হয় ১৯৪৮ সালে, সুবোধনারায়ণ চৌধুরী ভার নেওয়ার পর। কল্যাণ দত্ত ছিলেন কিছুদিন কর্তা। তার আগে পাঠভবনের একজন শিক্ষক পালা করে খেলার ভার নিতেন। কখনও সুধাংশুদা কখনও বিদ্যুৎদা কখনও রণজিৎদা। ক্রিকেট ভলিবল বাস্কেটবলের ব্যবস্থা থাকলেও জমত

বেশি ফুটবল। সুহৃদ কাপ, সর্বেশ কাপ প্রহস্থ কাপ, ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ছাড়াও মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সমেত বাইরের অনেক দল খেলতে আসত। আমাদের দল বেশ জোরালো ছিল। রেণ্টুদা অনুদা মণ্টু রায়দা (শান্তিপ্রিয়) মণ্টু ঘোষদা সুনীল সরকার সন্তোষ ব্যানার্জি সুধীর দাস জহর ঘোষ সুখময় মিত্র সিস্টা পুরুষোত্তম প্রাণ-কুমার গাঙ্গুলি সুজিত মিত্র প্রবীর গুহঠাকুরতা বিশ্বজিৎ রায় প্রণব গুহঠাকুরতা প্রবুদ্ধ ঘোষ মাখন কর তপেন নিয়োগী অসীমদা বঙ্কুদা রবিদা তখন বাঘা খেলোয়াড়। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ভাল খেলত শিবকৃষ্ণ কর চিত্তরঞ্জন দাস তান লী নৃপেন সিংহ হীরকজ্যোতি দত্ত জয়দেব প্রণব ব্যানার্জী প্রণব গাঙ্গুলি প্রশান্ত দীপঙ্কর বসু রণজিৎ রায় সত্যরঞ্জন ঘোষ সুজিত রায়। এখন মেয়েদের ফুটবল ক্রিকেট খেলার রেওয়াজ হয়েছে। সেই কবে রবিদার মেয়ে পূর্ণিমা জার্সি পরে বুটপায়ে ফুটবল খেলত। মেয়েরাও খেলা দেখত, চেঁচাত। ওরা যে জায়গায় বসত, তার কাছাকাছি বাইরের দলের লেফট আউট বা রাইট হাফ মেয়েদের খিলখিল হাসির আওয়াজে খেলতেই পারত না। প্রবীণাদের মধ্যে খেলার মাঠে সব সময় হাজির থাকতেন বিশ্বজিতের মা—মাসিমা।

চৈতীর বাঁ দিকে চলে গেছে শ্রীভবন, কলাভবন, সংগীতভবন। কলাভবনের পাশে বলে আমরা সংগীত ভবনকে বলতাম 'গলাভবন।' সংগীত ভবনে তখন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। প্রনেত্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। সেতারে সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, এসরাজে অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উচ্চাঙ্গ সংগীতে ওস্তাদজী অর্থাৎ ওয়াঝেলওয়ার। পরে কয়েক বছরের জন্য আসেন পি এন চিনচোরে। তারও পরে রবীন্দ্রলাল রায়। তাঁর কন্যা মালবিকা কানন তখনও ভারত বিখ্যাত হননি। কথাকলিতে বালকৃষ্ণ মেনন। কথাকলিতে আগে ছিলেন কেলু নায়ার ও কৃষ্ণন কুট্টি। মেননের পর চন্দ্রশেখর কিছুদিন। তার পরেই গুরু কুঞ্জু কুরুপের ছেলে হরিদাস নায়ার। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের

পরিকল্পনায় তাঁর দান অনেকখানি। মণিপুরীতে বিহারী সিং। ১৯৪৬ সালে বিহারীদা গৌরপ্রাঙ্গণে প্রধানত তারই লেখা বাংলা গানে মণিপুরী রাস করিয়েছিলেন। সে নাচ এখনও চোখে ভাসে, সে গান এখনও কানে মধু ঝরায়। মণিপুরী নাচই শান্তিনিকেতনের আদি। ১৯১৯ সালে সিলেটে মণিপুরী নাচ দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিমন্ত সিংকে নিয়ে আসেন। তারপর একে একে নবকুমার সিং অতম্বা সিং নীলেশ্বর মুখার্জী। তার মধ্যে নবকুমারের দান বিরাট। তাঁর তৈরি বহু নাচ এখনও চালু। যেমন খোল দ্বার খোল, আমার এ রিক্ত ডালি ইত্যাদি। ভরতনাট্যম শান্তিনিকেতনে কম শেখানো হয়েছে— একবারই মাত্র রাজারাম নামে এক শিক্ষক আসেন। কথক শেখানো হত বলেও শুনিনি। বহু আগে আশা ওঝা নামে এক ছাত্রী কথক নেচে সকলের মন ভোলান। আমাদের সময় বিনোদ চোপড়া ও শান্তি সাবাথ আলাদাভাবে কথক নাচত। মোহনলাল বাজপেয়ী যখন শতরঞ্জ-কি খিলাড়ি নাটক হিন্দীতে করান, বিনোদ ও শান্তি কথক নেচেছিল। সিংহল থেকে আসা ছাত্রদের ক্যাণ্ডি নাচের প্রভাবও পড়ে শান্তিনিকেতনের নাচে। দেখা না দেখায় মেশা, শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ইত্যাদি গানে ক্যাণ্ডি নাচের ভঙ্গী থাকত। তবলায় ছিলেন উমাপদ ঘোড়ুই। পরে এলেন অনাদি দত্ত ও সঞ্জয়দা। নাচে সেবা মাইতি পরে মিত্র এবং গানে কণিকা মুখোপাধ্যায় পরে বন্দ্যোপাধ্যায় সবে শিক্ষক হয়ে ঢুকেছেন। ছাত্রছাত্রীরা পরে সবাই নামজাদা হন। সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় পরে মিত্র, নীলিমা গুপ্ত পরে সেন, কমলা সেন পরে বসু, গীতা নাহা পরে সেন, চিত্রা মজুমদার পরে বড়ুয়া, বেলা রায় পরে ভট্টাচার্য, আরতি গুপ্ত পরে বসু, গীতা হাজরা পরে রক্ষিত, মীনাক্ষি বসু, বীরেন পালিত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (অশোকের ডাক নাম তরু। নামের সঙ্গে তরু জুড়ে দেন শৈলজাদা।), অরবিন্দ বিশ্বাস, হামিদুল হক, শৈলেন দাস, রবীন নাগ, প্রীতিভূষণ গোস্বামী, প্রসাদ সেন, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, পরিমল হোম, প্রফুল্লকুমার দাস,—

কত নাম আর বলব। সুপূর্ণা ঠাকুর গীতা ঘটক জয়শ্রী রায় মায়া সেন সুভাষ চৌধুরী আতিকুল ইসলাম বুলবুল সেনগুপ্ত ছাত্রছাত্রী হয় পরে। গীতার ছোট বোন ঋতাও সংগীত ভবনে পড়ত। সে শিখত কথাকলি। এখন নামকরা ঠুংরি গাইয়ে। সুভাষ খুব ভাল অভিনয় করত কমিক চরিত্রে। এখন ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন তার স্ত্রী সুপর্ণার সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে চালায়। সুবিনয় রায় ও সুজিতরঞ্জন রায় খুব আসতেন। আসতেন নীলমাধব সিংহও।

কলাভবনের শীর্ষে ছিলেন নন্দলাল। সঙ্গে বিনোদবিহারী রামকিঙ্কর বিনায়ক মসোজি (মসোজি চলে গেলে এলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা।) বিশ্বরূপ বসু পেকমল গৌরী ভঞ্জ যমুনা সেন। কয়েক বছর পর অধ্যাপক হয়ে আসেন সুখময় মিত্র। পৃথ্বীশ নিয়োগী কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি পঞ্চাশের দশকে আসেন নন্দনতত্ত্বের অধ্যাপক হয়ে। ননী ঘোষও শিক্ষক হন কারুশিল্পে।

পুরোনো সেই নন্দন বাড়ির তুলনা নেই। বাড়ির ভেতরে হ্যাভেল হল। হলে ঢুকতেই দু'খানা বিরাট ছবি। অবনীন্দ্রনাথের আলমগীর, নন্দলালের উমার তপস্যা। মাস্টারমশাই অর্থাৎ নন্দলাল বসু নন্দনের বারান্দায় বিরাট একটা গং-এর পাশে বসতেন। কেউ চাইলেই ছবি এঁকে অটোগ্রাফ দিতেন। ফুল বা গাছের পাতা ছিঁড়লে বকতেন। বড় শান্ত, বড় পবিত্র ছিল কলাভবনের পরিবেশ। মাস্টার মশাইয়ের পরনে থাকত হাঁটুর দিকে একটু তোলা খদ্দরের পাজামা, খদ্দরের খাট পাঞ্জাবি আর গরমের দিনে আরবের শেখদের কায়দায় মাথায় তোয়ালে। আস্তে হাঁটতেন, আস্তে কথা বলতেন। তাঁর উপস্থিতি উজ্জ্বল করে রাখত আশ্রমকে। মাস্টার মশাইয়ের অনুকরণেই ছিল কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের পোশাক। বিনোদদা তখনই চোখে যৎসামান্য দেখেন। হিন্দীভবনে কৃপাল সিং শেখাওয়াত মাজি সুব্রহ্মণ্যম প্রমুখ ছাত্রদের নিয়ে হিন্দীভবনে তাঁর ফ্রেসকো করার দৃশ্য এখনও চোখে ভাসছে। কিঙ্করদার সৃষ্টিতে তখন

ভরা জোয়ার। বেচারা মসোজি—তাঁর নামের শেষাংশে 'জি' থাকায় গোঁসাইজি পণ্ডিতজীর মত শুধু মসোজি নামেই তিনি সম্বোধিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন বিশালকায়। সেই বিশালত্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিরাট একটা এসরাজ কাঁধে হাজির থাকতেন বসন্ত রাত্রের বৈতালিকে, মন্দিরের উপাসনায়, সিংহসদনের অনুষ্ঠানে। তিনি ভাল স্পোর্টসম্যান ছিলেন। শান্তিনিকেতনের খেলার ভার তিনি ঘাড়ে নিয়েছিলেন দীর্ঘকাল। নাটক হলে মঞ্চ বাঁধতেও তিনি ছিলেন ওস্তাদ। মানস সরোবরে তিনি গিয়েছেন, যোগ দিয়েছেন গান্ধীজীর দাণ্ডী অভিযানে। ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী, সজ্জন। ১৯৪৮ সালে একটি বিশেষ মনোবেদনা নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়েন এবং শেষ জীবন কাটান নাগপুরে। তাঁর অভাব আশ্রম জীবনে অভাব হয়েই থেকেছে। কলাভবনে পরে অধ্যাপক হন রাধাচরণ বাগচি এবং কিউরেটার হয়ে আসেন প্রশান্ত রায়। তিনিও খুব ভাল ছবি আঁকতেন।

কলাভবনে তখন পরবর্তীকালে বিখ্যাত ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়। কৃপাল সিং, শঙ্খ চৌধুরী, জয়া আপ্পাস্বামী, চিত্রলেখা ডি ফনসেকা, মঙ্গলা পারেখ, পঙ্কজম নাইডু, নটরাজন, রামকুমার, ইরা ভাকিল, নির্মলা দয়ালদাস, বিজয়া পট্টবর্ধন, কল্যাণী বরুয়া, নিরঞ্জন মিশ্র, দিনকর কৌশিক, উষারঞ্জন দত্তগুপ্ত, কৃষ্ণা রেড্ডি, প্রসন্ন রাঘবরাও, সুনীতি মিত্র, রবিন চ্যাটার্জি (সুনীতিদা রবিদা বাংলা সিনেমার নাম করা শিল্প নির্দেশক), জিতেন্দ্রকুমার, জগদীশ মিট্টাল, দয়ানন্দ ডিমাল, অনিলকান্ত মজুমদার, অজয় চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পাল, দ্বিজেন সেন, ঋতেন মজুমদার, কিরণ বরুয়া, বিনোদিনী দেবী, সোনালি সেনরায়—কত নাম বলব। এই সোনালির সঙ্গেই পরে বিয়ে হল খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক রোজেলিনির। মণিপুরের বিনোদিনী সাহিত্য সংগীত নৃত্য চলচ্চিত্রে কীর্তিমতী। প্রসন্নদা কর্ণাটকের লোক। তার বোন বাণীও পড়ত কলেজে। প্রসন্নদার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল হাতের দশ আঙুল

দিয়ে ছায়া নাটক দেখানোর। তিনি প্যারিসের বিখ্যাত কোন নাইট ক্লাবে পাঁচ মিনিট ওই ছায়া নাটক দেখিয়ে প্রচুর পয়সা কামিয়েছেন। কলাভবনের একদল ছাত্র থাকতেন ব্ল্যাক হাউসে। অসাধারণ বাড়ি, নানারকম শিল্পকর্ম ছড়ানো। ওই বাড়িতে বাস করা ছিল বিশেষ মর্যাদার। অনিলকান্ত মজুমদার বা শীতুদা থাকতেন ওই বাড়িতে। আমাদের কলেজের অনেকের বিরাট আড্ডা ছিল তাঁর ঘরে। বম্বে প্রবাসী শীতুদা এখনও সেই ধরনের আড্ডা চালিয়ে যাচ্ছেন তার ডেরায়। মনে পড়ছে কালু মিঞার কথা। অন্ধ গায়ক। থাকতেন কলাভবন হস্টেলে। লাঠি হাতে একা একা হাঁটতেন আর সন্ধ্যায় মন্দিরে গান গাইতেন। মন্দিরে গান গাইতেন বিমল ভট্টাচার্যও।

শ্রীভবনের এপাশে কিচেন। তখন এই একটিতে সব ভবনের ছেলেমেয়েরা খেত। নিরামিষ আমিষ দুটোই চলত। অনেক অধ্যাপক আবার টিফিন কেরিয়ারে এখান থেকেই বাড়ির খাবার নিয়ে যেতেন। অনেকে খেতেও আসতেন—যেমন তেজেশদা, তনয়দা, গোঁসাইজি, মসোজি, অমিয়দা। এই কিচেন ছিল আমাদের মেলা-মেশার জায়গা। অন্য ভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দেখাশোনাও হত কিচেনে। চারদিক থেকে আসত খেতে যাওয়ার লাইন। খাওয়া-দাওয়ার পর কিচেনের সামনে চৈতীর পিছনের আড্ডা ছিল আমাদের ছাত্রজীবনের দুর্লভ ধন। এই কিচেনে আসার সময় আমরা যে যার ভদ্র পোশাক পরে আসতাম। চুলে চিরুনি চালাতাম। একটু ভব্যসব্য হয়ে কে কতটা শালীন কমপিটিশান চালাতাম মেয়েদের সামনে। আমরা বলতুম 'মাঞ্জা দেওয়া'। খাওয়া শেষ হলে চৈতীর পিছনে দাঁড়াতাম কাঙ্খিত বান্ধবীদের জন্যে। পাঁচ দশ মিনিট গল্প। তাতেই খুশি। আবার যে যার হস্টেলে।

কিচেনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রবিদা। সত্যি সত্যি দাদার মতই আমাদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি করতেন। ভূপেনদার উপর ছিল ভাঁড়ারের ভার। সকালে দুধ বা কোকো লুচি তরকারি বা পাউরুটি

মাখন, দুপুরে ভাত ডাল মাছ দই, বিকেলে কোকো বা চা, হালুয়া বা মুড়ি-বুঁদে এবং রাত্রে ভাত ডাল ডিম। ধোকা ও ছানার ডালনা মাঝে মাঝে। সপ্তাহে একবেলা মাংস। এই ছিল খাবার। খেতাম খুব তৃপ্তিতে। তবে তখন তরকারী বিশেষ পাওয়া যেত না। কেবল খেরো আর ডিংলা। দই আসত ভাগলপুর থেকে, আলুও বাইরের। সব কিছুতেই থাকত আলু। বহু বছর আগে এই কিচেনেরই খাবার খেয়ে সুকুমার রায় গান বেঁধেছিলেন—এইতো ভাল লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়। তবে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওখানকার ঠাকুর চাকরদের সঙ্গে। রাজকেষ্ট, প্রভাকর, জয়, উমাপদ, কালীপদ আমাদের যত্ন করে খাইয়েছে। দই দিতো বৈকুণ্ঠ। এত কম দিত যে, তার নাম দিয়েছিলাম দৈকুণ্ঠ। সর্বোপরি ছিলেন সরোজিনীদি। বয়স্কা বিধবা মহিলা। আমরা কেমন খেলাম তার খোঁজ নিতেন। মনে আছে বার্ষিক বা ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে যাবার আগে সরোজিনীদি কিচেনের দোরগোড়ায় কলাগাছ মঙ্গল কলস বসিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কপালে দইয়েব ফোঁটা দিতেন এবং নিজে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াতেন। আমরা ভুলে যেতাম আমরা বাড়িতে নেই।

চৈতীর সামনের দিকে রাস্তা চলে গেছে উত্তরায়ণের দিকে। উদয়ন বাড়ির জাপানী ঘরে তখন ছিল ছোট্ট রবীন্দ্রসদন। আমি গিয়ে দেখি অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কৃপালানি আর রবীন্দ্র অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। অমিয়কুমার সেন গবেষক। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কিউরেটর, মোহিত মজুমদার সহকারী। চিত্তরঞ্জন দেবও রবীন্দ্র সদনের কর্মী সেই থেকে। উত্তরায়ণ যাওয়ার পথে এপাশে জলের কল, ওপাশে ছাতিমতলা। আর তার পেছনে ছিল মন্দির, তারপর শান্তিনিকেতন বাড়ি। জলের কলের পাশে বিজলির দপ্তর, পাঠভবনের ছাত্রদের হাতের কাজের ক্লাস ও ছাপাখানা। ওই বাড়িটার নাম রাজশেখর বসুর নামে রাজশেখর বিজ্ঞান সদন। ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন যতীন বিশ্বাস। পঞ্চাশের দশকে এলেন সিতিকণ্ঠবাবু। ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড

বিভাগও হয় পঞ্চাশের দশকে। ভার নেন অজিত মুখার্জি। কাজ দারোয়ানদের তদারকি, কিন্তু তিনি বাংলা গল্পের অনেক ইংরেজি অনুবাদ করে নাম করেছিলেন। শ্রীভবনের বড় মেয়েদের ওয়ার্ডেন ছিলেন প্রীতিদি। তারপর কনকদি। কনকদির পর সুধাদি। ছোটমেয়েদের দেখাশোনা করতেন আর এক সুধাদি। তাঁর রং ফরসা ছিল। দুজনের তফাৎ বোঝাতে আমরা বলতাম পূর্ণিমা সুধাদি ও অমাবস্যা সুধাদি।

চৈতীর পূব দিকের রাস্তা গেছে শালবীথির দিকে। প্রথমেই অফিস বাড়ি। তিন চারখানা ঘরেই সব। সচিব সুরেন্দ্রনাথ কর। রথীদার পরেই তিনি। তখন অবশ্য রথীদার ডান হাত বাঁ হাত ছিলেন সুরেনদা আর অনিলদা—অনিলকুমার চন্দ। অনিল-সুরেন-রথী—এই তিনজনের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে আমরা বলতাম অ-সু-র রাজত্ব চলছে। সুরেন করদা চুপচাপ ভাল মানুষ। কিন্তু চারদিকে কড়া নজর। কথা কম বলতেন, কিন্তু থাকতেন খেলার মাঠে, গানের আসরে, ঋতু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায়, নাটকের মহড়ায়, অতিথি আপ্যায়নে। তার উপর অফিসের কাজ তো আছেই। এত বড় চিত্রশিল্পী, তবু শান্তিনিকেতনের দুর্দিনে পাচমিশেলি কাজ করেছেন পরম নিষ্ঠায়। সচিব সুরেনদার সহকারী ছিলেন শৈলেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী (পরে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব), অচ্যুতানন্দ ঘোষ এবং ক্ষিতীশ রায়। ক্ষিতীশদা যেমন সুদর্শন, তেমনি সুকণ্ঠ। তাছাড়া গান জানেন, কবিতা আবৃত্তি করেন, অভিনয় করেন, ম্যাজিক দেখান, লিখতে পারেন—সর্বোপরি মিশুকে। ক্ষিতীশদার সঙ্গ আমাদের ভাল লাগত। এখনও লাগে। সচিবের অফিসে তখন কাজ করতেন পরবর্তীকালের কর্মসচিব বিদ্যুৎরঞ্জন বসু। বিদ্যুৎদার সঙ্গে আমাদের মেশামেশি ছিল খুব। আমাদের সঙ্গে এক্সকার্সনেও গিয়েছেন। বিদ্যুৎদা যে এককালে নাচতেন, একথা আজ কে বিশ্বাস করবে। অনেক পরে আসেন শৈলেশচন্দ্র সেন।

অফিস বাড়ির গায়েই লাইব্রেরি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরিয়ান। দাড়িমুখে প্রভাতদা তখনই রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ভঙ্গীতে হাঁটতেন। আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখলে বলতেন, "বিলেতে পোয়াতিরা এসব খেলে। তোরা হাডুডুডু খেলতে পারিসনা?" প্রভাতদার কথায় হাডুডুডু খেলতে গিয়ে পা মচকে তিন দিন হাসপাতালে ছিলাম। তার সহকারি ছিলেন সত্যদা—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, চৈতিদা—জ্যোৎস্নাময় ঘোষ চৈতিদা ভাল গীটার ও বেহালা বাজাতেন। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসও লাইব্রেরিতে কিছুদিন কাজ করেন। বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল-কুমার দত্ত যোগ দেন পরে। তখন লাইব্রেরিতে যখন খুশি ঢুকে যে কোন তাক থেকে যে কোন বই এনে পড়া যেত। প্রভাতদা আমাদের খুব সাহায্য করতেন। অনেক বইয়ে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর ও মার্জিনে তাঁর মন্তব্য দেখে অবাক হতাম। এসব বই এখন রবীন্দ্র-সদনে সরানো হয়েছে।

লাইব্রেরির উপর তলাই ছিল বিদ্যাভবন। এক এক ঘরে এক এক জন পণ্ডিত বসে কাজ করে চলেছেন। ক্ষিতিমোহন সেন, হরিদাস মিত্র, সুখময়শাস্ত্রী, বিক্রমজিৎ হজরত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি আদামউদ্দিন। ক্ষিতিমোহনবাবু চাদর গায়ে এবং একটি থলি হাতে খালি পায়ে আসা যাওয়া করতেন। মন্দিরে তার উপাসনার ভাষণ এখনও কানে বাজছে। তখন তাঁর দাড়ি ছিল না। দাড়ি রাখেন ১৯৫২ সালে, তাঁর বিয়ের স্বর্ণ জয়ন্তীতে। পঞ্চানন মণ্ডল সে সময়ই নেন বাংলা পুঁথির ভার। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই বসতেন চীনভবনে। তিনি চলে গেলে পর তাঁর জায়গায় আসেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি। চীনভবনে আর একদল পণ্ডিত এক একটি ঘরে নিযুক্ত ছিলেন গবেষণায়। তানসাহেব ডঃ বাগচি ছাড়া ছিলেন ডঃ বাপট, শান্তিভিক্ষু, আয়াস্বামী, ডঃ ফা-চু, ডঃ উয়েই, সুজিত মুখোপাধ্যায়, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীরঞ্জন সেন, ডঃ প্রহ্লাদ প্রধান, ডঃ রামকিঙ্কর

সিং। তখন চীনভবনে জোর কাজ চলছে। চীনে গৃহযুদ্ধের সময় ডঃ বাগচি, সতীরঞ্জন ও অমিতেন্দ্রনাথ পিকিঙে ছিলেন। ডঃ বাগচি ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু ছাতায় ফিটফাট বরাবর। ছাতা ব্যবহার করতেন লাঠির মতন। তিনি হাঁটতেন অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে এবং সদর রাস্তা থেকে নেমে এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে চলতেন। তাই তাঁর দু ফার্লং রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে চার ফার্লং হয়ে যেত।

হিন্দীভবনে তখন অধ্যক্ষ পণ্ডিতজী—হজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং মোহনলাল বাজপেয়ী ও রামপূজন তেওয়ারি। বাজপেয়ীজী বরাবর ফিটফাট। তিনি তখন গুরুদেবের গান ও গল্প অনুবাদ করে নাম করেছেন। উদয়ের পথের হিন্দী 'হমরাহী' তাঁরই অনুবাদ। পণ্ডিতজীর আলাদা একটা বেড়ানোর দল ছিল। রোজ বিকেলে পূর্বপল্লীর দিকে এক সঙ্গে বেরোতেন তেওয়ারিজী, উপেনদা, নগেনদা, গোঁসাইজি ও হরিদাস মিত্র মশাই।

লাইব্রেরির সামনে গৌরপ্রাঙ্গণ—গৌরগোপাল ঘোষের নামে। মাঝখানে সিংহসদন রেখে এপাশে পূর্বতোরণ ও শমীন্দ্র কুটির। ওপাশে পশ্চিমতোরণ ও সত্যকুটির। পেছনে মোহিত কুটির ও সতীশ কুটির। গোটা এলাকাটাই পাঠভবন অর্থাৎ স্কুলের ছেলেমেয়েদের দখলে। এখন যেমন, আগেও পাঠভবন ছিল সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে উজ্জ্বল। সিংহসদনে তখন নাচ গান অভিনয় হত, হত বার্ষিক পরীক্ষা। অভিনয়ের আর একটি জায়গা ছিল লাইব্রেরির বারান্দা। পাঠভবন এলাকার একটু পূর্বেই শিশুবিভাগ—সন্তোষালয়। সেখানে শিশুদের দেখাশোনা করতেন কণা মাসিমা। ঘুম পাড়ানো, গল্প বলা, আদর করা, আচার দেওয়া ছিল তার কাজ। তিনি ছোটদের বুঝতে দিতেন না ওরা মায়ের কাছে নেই। সেখানে থাকতেন ধনপতি লাহাও। ছোটদের অন্য কাজ তিনি দেখতেন।

লাইব্রেরির লাগোয়া প্রাক কুটির। সেখানে কয়েকটি ঘরে থাকতেন রিসার্চ স্কলাররা। আজকের বিখ্যাত সাংবাদিক ও সংবাদ-

সংগঠক চঞ্চল সরকার কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছেন। তিনি এই প্রাক কুটিরেই থাকতেন। প্রথম প্রথম অমিয়দা—ডঃ অমিয়কুমার সেন ওখানেই ছিলেন। থাকতেন দিলীপ বিশ্বাস, রামসিং তোমর, বিপুল রায়চৌধুরী। তিনজনই এখন নানাস্থানে নানা বিষয়ে নাম করা অধ্যাপক। প্রাক কুটিরের পাশে নাট্যঘর। আমাদের সময় ওটা কোন কাজে লাগত না। নাট্যঘরের কাছেই মাধবী বিতান পুরনো ঘণ্টাতলা আম্রকুঞ্জ বকুলবীথি শালবীথি। মন্দিরের গায়ে পুকুর আর পাহাড়। এখন কিছুই আর নেই। পাহাড়ের ওপাশে পান্থনিবাস। পান্থনিবাসের দেয়ালে সুন্দর ফ্রেসকো ছিল। ষাটের দশকে চুনকাম করে সব মুছে দেওয়া হয়েছে। ভ্যাণ্ডেলিজম আর কাকে বলে!

শালবীথির গায়ে এই সেদিনও ছিল পুরানো বীথিকা গৃহের চাতাল। এখন নেই। শালবীথির শেষ প্রান্তে দেহলির উল্টো দিকে খড়ের দ্বারিক বাড়ি ছিল দেখবার মত জিনিস। বাড়িটা মায়ের পাঠানো টাকায় তৈরি করেছিলেন পিয়ার্সন সাহেব। প্রথম মেয়েদের হস্টেল ছিল, পরে কলাভবন। আমাদের সময় ছিল কলেজের অফিস। অনিলদা ওখানেই বসতেন। সেই বাড়িটা ভেঙে দেওয়া হল ১৯৫৩ সালে। তেমনি মাটিতে মিশে গেছে দ্বারিকের পাশে নেবুকুঞ্জ — যেখানে একদা থাকতেন মীরাদেবী ও নগেন গাঙ্গুলি।

এইতো শান্তিনিকেতনের তখনকার চেহারা। শ্রীনিকেতনও ছিল ছোটখাট। শ্রীনিকেতনে তখন ভারপ্রাপ্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তারপর হন ধীরানন্দ রায়। তাঁর সহকারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। চারুবাবু বেশির ভাগ সময় কলকাতাতেই থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন। ধীরাদা জগদানন্দ রায়ের ভাইপো। দীর্ঘদিন তিনি শ্রীনিকেতনের ভার নিয়েছিলেন। আস্তে চলতেন, আস্তে কথা বলতেন, আর মুখে থাকত মৃদু হাসি। নানা সময়ে নানা অনুরোধ রেখেছেন আমাদের। জ্যোৎস্না দত্ত যখন কলাভবন থেকে পাশ করে বেরোল, বললাম,

ধীরাদা, ওকে শ্রীনিকেতনে কিছু কাজ দিন। ধীরাদা ওকে পটারি-তে বৃত্তি দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন। ঘুরতে ঘুরতে কঙ্কন উপকূল থেকে কামাথ পদবীর একটি ছেলে এসে হাজির। বড় বিপন্ন। ধীরাদাকে বলামাত্র তাকে তাঁত বিভাগে বৃত্তি দিয়ে ভর্তি করলেন।

এলমহার্স্ট সাহেবের যাতায়াত তখনও চলছে। তাঁকে দেখতাম প্যান্টশার্টের উপর গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে সাইকেলে ছুটছেন গ্রামের দিকে। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ সমীরণ চট্টোপাধ্যায় তারকচন্দ্র ধর জ্ঞান ঘোষ মনোরঞ্জন চক্রবর্তী অমর ঘোষ সন্তোষভঞ্জ চৌধুরী শিশিরকুমার ঘোষ সন্তোষ মিত্র কেদার গুহ মণীন্দ্র সেন মণীন্দ্র রায় প্রমুখ তখন শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। লোকশিক্ষা সংসদের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশিরদা ভাল অভিনয় করতেন, গান গাইতেন, বাঁশি বাজাতেন, ছবি আঁকতেন, এবং সর্বোপরি ভাল আড্ডা দিতেন। তিনি একদা থাকতেন শ্রীনিকেতন খেলার মাঠের গায়ে গাছের ডগার বাড়িতে। লক্ষ্মীশ্বরদা কাঠের কাজে ওস্তাদ এবং ছিলেন এসপেরান্টো ভাষা বিশারদ॥

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজনের কথা বলি। নইলে আমার স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের নিচুতলার কর্মীদের কথা বলছি। কারো নাম রাকেশ শুনলেই ধরে নেবেন বাড়ি সিলেট, তেমনি প্রভাকর যদি কারো নাম হয়, নির্ঘাৎ বীরভূমের লোক। আমি যখন শান্তিনিকেতনে পড়ি তখন নানা রকম কাজ করেন এমন লোকের মধ্যে অন্তত সতেরো জন প্রভাকর ছিলেন। কিচেনে রাঁধুনি প্রভাকর, স্কুলে পিয়ন প্রভাকর, কলেজে বেয়ারা প্রভাকর, চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলে প্রভাকর, এঁদের সকলকে নিয়েই তখন ছিল আশ্রম পরিবার।

তখন আশ্রমের একমাত্র মুচি ছিল বাঙালী। নাম বাঙালী, বাড়ি বিহারে। বাঙালী বসত কিচেন বা মেয়েদের হস্টেল শ্রীভবনের সামনে। দুটোই লাগোয়া। বাঙালীর ব্যবসা ভাল চলত না

শান্তিনিকেতনে। অসুখ বিসুখ করলে এবং কলকাতা যাওয়ার সময়ই কেবল সবাই জুতো পরত। অন্য সময় খালি পা। কেউ যদি জুতো না পরে তবে জুতো সারাই করবে কে? তবু সামান্য কিছু পেরেক মারামারির কাজ করত বাঙালী। সে আমাদের সকলের বন্ধুস্থানীয় ছিল। শান্তিনিকেতনে পড়ার পাট চুকোনোর পর পুরোনো ছাত্রদের দেখলে বাঙালী ছুটে আসে। অবাঙালী ছাত্রদের ধারণা ছিল বাংলো ভাষায় মুচিকে বলে বাঙালী। মুথু নামে (যার পুরো নাম তিবারম কৃষ্ণমূর্তি মুথু বেঙ্কটরামণ চেট্টিয়ার) একজন তামিল ছাত্রের (নাকি অন্ধ্রপ্রদেশের সুব্বারাওয়ের) হাওড়া স্টেশনে নামা-মাত্র জুতো ছিঁড়ে যায়। মুথু সবাইকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন, "আচ্ছা এখানে 'বাঙালী' কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?" প্রশ্ন শুনে কেউ ক্রুদ্ধ কেউ বিস্মিত। কেউ কেউ আবার তাকে পাগল বলেও ভাবে।

বিকেলে বাঙালী চলে গেলে সেই জায়গায় এসে দাঁড়াত সরযু। চানাচুরওয়ালা। আর একজন পদ্মফুল নিয়ে আসত। তার নাম ভুলে গেছি। বর্ষাকালে কেয়াফুল বিক্রি করতেও আসত দু'চারজন সাঁওতাল। সব পসরাই বসত কিচেনের সামনে, চৈতের কাছে। কারণ সেখানেই থাকত ছেলেমেয়েদের ভিড়। খেতে যাবার আগে বা পরে একটু আড্ডা, একটু ফিসফিস, একটু হাসি। একটু গানও। তারই মাঝখানে কেয়া কিংবা পদ্মের গন্ধ বেশ মানানসই হত।

শান্তিনিকেতনের পুরোনো ছবিতে আশ্রম দৃশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে আছে শালবীথিতে পাতা-কুড়োনি কিছু সাঁওতাল মেয়ের ছবি। সেই ছবি অমর হয়ে আছে নন্দলাল বসুর কিছু স্কেচে। এই সাঁওতালরা পিয়ার্সন পল্লী থেকে আসত কামিন হয়ে। শালের মঞ্জরী আর ওদের খিলখিল হাসি বসন্ত ঋতুকে দিত নতুন মাত্রা। তাছাড়া, সকাল-দুপুর-সন্ধে ছড়িয়ে আছে কিছু গাধার ছবি। ওরা সেকালে আশ্রমমৃগের মত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত। এমন কি, আমাদের খোলা ক্লাসের কাছাকাছি ঘুরঘুর করত। এই গাধাদের মালিক ছিল

সুখুয়া, হীরালাল ছত্তর প্রমুখ ধোপারা। প্রতি বুধবার ছুটি। সেদিনই গাধাদের বেশি ভিড়। কারণ বুধবার বাড়িতে বাড়িতে এবং হস্টেলে হস্টেলে ধোপারা আসত গাধাবোঝাই কাপড় নিয়ে। স্কুলের ছোটরা গাধাকে ঘোড়া হিসাবে ব্যবহার করত প্রায়ই এবং কেউ কেউ গাধাদের চোখ কাপড়ে বেঁধে ছেড়ে দিত শালবীথি বা আম্রকুঞ্জে। তারপর নানারকম কেলেঙ্কারি। ওদিকে ছোট ছেলেরা তখন 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী' গানের নকলে গলা ছেড়েছে—'হায় সুখুয়ার গাধা, তোমার নয়ন কেন বাঁধা।" সেই গানের সঙ্গে গাধার চিৎকার গোটা আশ্রম মাত করে রাখত। ঠিক তখনই দেখা যেত, হস্টেলের মেথর তার কাজকর্ম সেরে হাঁড়িয়ার ঝোঁকে চেঁচিয়ে গান ধরেছে—"মোদের শান্তিনিকেতন।" তার উচ্চারণে শোনা যেত "মদের শান্তিনিকেতন।" মদের ব্যাপারে কেউ কিছু বললে সে বলত, "কেনে, গুরুদেববাবু তো বলে গেছে মদের শান্তিনিকেতন।" এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আশেপাশের পিয়ার্সন পল্লী, ভুবনডাঙা, গোয়ালপাড়া, বাঁধগোড়া, ফুলডাঙা, আদিত্যপুর, বিনুরিয়া, মহিদাপুর গ্রামের লোকেরা—যারা দিনমজুরির বা অন্য কাজ করতে আসত—তারা কদাচিৎ 'শান্তিনিকেতন' বলত। তাদের মুখের কথায় জগদ্বিখ্যাত জায়গাটির নাম শুধু 'শান্তিনি'। কেউ কেউ বলত গুরুদেববাবু।

সংগীতভবনের বেয়ারা ছিল ভাঙ্গী। মাথায় টাক। গোঁফ দাড়ি নেই, ভুরুও কম। মনে হত যেন কুমোরবাড়ি থেকে অসম্পূর্ণ একটা মূর্তি হঠাৎ চলে এসেছে। সাতুই পৌষের মন্দিরে কিংবা বসন্তোৎসবে—ভাঙ্গীই তানপুরা এসরাজ ইত্যাদি যত্ন করে সাজিয়ে রেখে যেত গানের জায়গায়। আশ্রমের কোন অনুষ্ঠানের কথা মনে হলে ভাঙ্গীর চেহারা আমার সর্বপ্রথম মনে আসে। যেমন নাচের কথা হলে ভাসে আদিত্যপুর গ্রাম থেকে রোজ হেঁটে আসা শ্যাম কর্মকারের কথা। তিনি খোল বাজাতেন নৃত্যনাট্য বা এমনি নাচে। চমৎকার হাত। খোল বাজাতে বাজাতে তাঁর মুখের আদলও যেন খোলের মত লম্বাটে.

হয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত বিখ্যাত সব নৃত্যানুষ্ঠানে শ্যাম কর্মকারের দান প্রচুর।

কলাভবনের বেয়ারা বা ফাইফরমাস খাটনেওয়ালা গোলক পরে হয়ে যায় অসাধারণ শিল্পী। রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গে থাকতে থাকতে সে ছবি আঁকা শিখে যায়। তারপর চাকরি নিয়ে দিল্লীর বাসিন্দা হয়। যতদূর মনে পড়ে, গোলক ছিল সাঁওতাল। এমনই দুর্ভাগ্য যে, পরে নাকি তার মাথার গণ্ডগোল হয় এবং অকালে মারা যায়। গোলকের পরে আসে রতন, সেও ভাল ছবি আঁকতে পারত। স্পোর্টস বিভাগে ছিল ফকির। শান্তিনিকেতনের খেলাধূলায় তার উৎসাহ ছিল দারুণ।

এবার ভরতের কথা বলি। আমাদের ছাত্রজীবনে ভরত ছিল শান্তিনিকেতনের একমাত্র ক্ষৌরকার। সেকালের ক্ষুদ্রাবয়ব আশ্রমে চুলদাড়িনখের অবাধ অগ্রগতি প্রতিহত করতে তখন ভরত ছাড়া আর কোন সশস্ত্র সৈনিক ত্রিসীমানায় ছিল না। বেঁটেখাটো চেহারা, ঘোলাটে চোখ, কদমছাঁট চুলে লম্বা টিকি—যাকে স্থানচ্যুত করার বাসনা প্রায়ই হত হস্টেলের ছেলেদের। বিশ্বজিৎ সত্যি সত্যি একবার তার টিকি কেটে দিয়েছিল। ভরতের কী রাগ! আতরওলার ধরনে পিঠে কাপড় বাঁধা যন্ত্রপাতি নিয়ে ভরত সকাল আটটা থেকে দুপুর দুটো বাড়ি বাড়ি ঘুরত। এখানে ডাক, ওখানে ডাক এবং ছুটির দিন বুধবার এলেই শিশু বিভাগের ছেলেরা লাইন বেঁধে মাথা পেতে দিত ভরতের হাতের দুই থাবার হাড়িকাঠে। একটু এদিক সেদিক করলেই তিনি ধমক—"আঃ! গণ্ডগোল কর না। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।"

ধমক হোক আর ঠাট্টাই হোক, ভরত নইলে কারও চলত না। বহু বাড়িতে সে তিন-চার পুরুষের চুল দাড়ি কেটেছে এক নাগাড়ে। আমি অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে জানি, দূর দূর জায়গা থেকে পৌষমেলার শান্তিনিকেতনে এসে ভরতকে দিয়ে বছরের মত চুল ছাঁটিয়ে নিতেন। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল অনিলকুমার চন্দ ১৯৫২ সালে মন্ত্রী

হয়ে দিল্লি চলে যান। কিন্তু দিল্লীতে চুল না কাটিয়ে যখনই শান্তিনিকেতনে আসতেন, ভরতকে ডেকে পাঠাতেন। আমার আর এক বন্ধু শুভময় পাক্কা দু'বছর পর আস্কন্ধলম্বিত চুল নিয়ে মস্কো থেকে ফিরে ভরতের হাতে মাথা সঁপে দিয়েছিল। শুভময়ের ছেলে কুকুনের চুল কাটতে বসে ভরত বলেছে, "খোকা, তুমহার বাবার চুল হামি কেটেছি, তুমহার দাদা কালীমোহনবাবুর চুল ভি হামি কেটেছি।" দ্রুত সাবালক হওয়ার আগ্রহে অধীর আমার মতো শত শত ছেলেকেও ভরত তার এনামেলের কটোরার জল গালে ছিটিয়ে ক্ষুর সহযোগে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছে এবং থুঁতনির রোঁয়া সাফ করতে করতে একগাল হেসে বলেছে—"ইবার আপনাকে খুবসুরৎ দিখাবে।"

মুঙ্গের জেলায় বাড়ি। থাকত পান্থনিবাসের পিছনে একটি ছোট্ট ঘরে। কবে শান্তিনিকেতনে এসেছিল মনে নেই। শুনেছি আগে আশ্রমে ছিল আববাস নামে এক ক্ষৌরকার। সেকালের ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় যার তিনটি ক্ষুর ছিল। দেয়াল-ঠেসিনী, হাড়ভেদিনী এবং রক্তকিংকনী। ভারতের ক্ষুর অবশ্য একটিই ছিল —দেয়ালঠেসিনী।

শান্তিনিকেতনে সাধারণ লোকের কথা বাদ দিই, বহু রথীমহারথী ভরতের কাছে মাথা নত করেছেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেনরা তো বটেই, প্রমথ চৌধুরী মশাইও ছিলেন ভরতের বড় খদ্দের। রোজ তাঁকে দাড়ি কামাতে সে যেত। ব্যাধিতে তিনি তখন প্রায় পঙ্গু, অন্যের সাহায্য ছাড়া ওঠাবসা সম্ভবও ছিল না, একমাত্র ভরতই নির্বিবাদে তাঁর ক্ষৌরকর্ম করে দিতে পারত। প্রমথবাবুর মুখে সব সময় থাকত সিগারেট, টানতে অসুবিধে হত বলে নিবে যেত প্রায়ই। ইন্দিরা দেবী বা অন্য কেউ একটু পরে পরেই আগুন ধরিয়ে দিতেন এবং তারই ফাঁকে ভরত অতি যত্নে রোজ সকালবেলা তাঁর দাড়ি কামিয়ে যেত। ভরত কলেজ হস্টেলে এসে বলত—"আরি

বাবা, এ-তো পালিশ গাল প্রমথবাবুর।" প্রমথবাবু কে সে সঠিক জানত না, শুধু জানত "বোহুৎ পড়ালিখা কোরেছেন প্রমথ্‌বাবু।"

"আর কার কার দাড়ি কামিয়েছ তুমি ভরত?"—আমাদের প্রশ্নের জবাবে সে বলতো—'রথীবাবু, সুরেনবাবু, নন্দবাবু, অবনীবাবু—সোব সোব। অবুনীবাবু একবার আসলেন লম্বা লম্বা দাড়ি লিয়ে। আমার বখশিস নোষ্ট হোয়ে গেলো।"

"রবীন্দ্রনাথকে তুমি কামাও নি?"—প্রশ্ন শুনে ভরত হাসে আর বলে—'রসিকৃতা হাম সমঝে, গুরুদেববাবুর দাড়ি কৌন কাটবে?" একটু থেমে ভরত আবার বলে—"লেকিন হাঁ, গুরুদেববাবুর পায়ের নোখ আমি দুবার কেটেছি। কেত্তো ডর লাগত। কী জানি চোটমোট লেগে যায়।"

ভারতের আফশোস, রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ছিল বলে। না থাকলে তাঁর দাড়ি কেটে সে পুণ্য অর্জন করতে পারত। একদিন বলেছিল, "গুরুদেববাবুকে লিয়ে মাহা মুশকিল। নিজে তো দাড়ি রাখছেনই, বোন্ধু যাঁরা আসতেন উঁয়াদেরও লম্বা লম্বা দাড়ি। রামানন্দ্‌বাবু (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়), বরজেনবাবু (ব্রজেন্দ্রনাথ শীল), এনগুজ সাহেব—সোব সোব। আর নিচু বাংলার বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), উঁয়ারও ছোটো ভাইয়ের কিসিম লম্বা দাড়ি। সোবাই যদি দাড়ি রাখেন তো হমার বখশিস মিলে কেমোন করে? লেকিন হাঁ, বড়বাবু, রামানন্দ্‌বাবু—সোবার আমি নোখ কেটেছি। মহাৎমাজীর ভি কেটেছি।"

গর্বে ভারতের দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে রবীন্দ্রনাথ নয়, অবনীন্দ্রনাথ নয়, মহাত্মা গান্ধীও নয়, ভারতের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা "মালবীয়জী" অর্থাৎ মদনমোহন মালব্যের দাড়ি সে কেটেছে। ভরত এমনভাবে কথাটা বলত, যেন তার জন্ম সার্থক হয়েছে মালব্যজীর দাড়ি কামিয়ে। যে ক্ষুরে সে তাঁর দাড়ি কামিয়েছিল, সেই ক্ষুরে আর কাউকে কামাত না, অনুরোধ করলে

বের করে দেখাতো এবং বলতো—"বিশোয়াস তো কোরবেন না, দেখে লিন একবার।"

ভরতের আর একটি গর্ব "পণ্ডিতজীর নাতি" রাজীবের চুল সে একবার কেটেছে। ১৯৪৫ সালে গান্ধীজী যখন শান্তিনিকেতনে, ইন্দিরা গান্ধীও শিশুপুত্র রাজীবকে নিয়ে ছুটি কাটাতে আসেন। সঞ্জয়ের—তখন নাম ছিল সঞ্জীব—জন্ম পরের বছর। নেহেরু অন্তত্রবার এসেছেন শান্তিনিকেতনে, কিন্তু তাঁর চুল-নখ কাটা বা দাড়ি কামানোর সৌভাগ্য হয়নি ভরতের। হাতের তেলোয় ক্ষুর ধার দিতে দিতে সে প্রায়ই বলত—"আপশোস কি বাৎ, লেকিন হামি পণ্ডিতজীর লাতির চুল তো কেটেছি।"

সেবার শান্তিনিকেতনের ভিতরেই চেয়ার-বসানো আয়না-টাঙানো এক সেলুন খুলেছে। দু-চারজন ছাত্র সেলুনে গিয়ে চুল কাটছে। ভরত তাই দেখে রাগে অভিমানে ফুলছে। যে সেলুনে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছে না।

ভরত সে সময় চোখে ভাল দেখতে পায় না। বৃদ্ধ এবং অথর্ব। তবু আমরা কয়েকজন তখনও তার কাঁচিতে বিশ্বাসী রয়ে গেছি, তাতে সে মহাখুশি। একদিন হাত জোড় করে এসে বলল, "নয়া আদমিরা সালুনে যাবে তো যাক, লেকিন আপনারা যারা পুরানো আদমি আছেন, সালুনে যাবেন না কোন দিন। গেলে হামি বহুত কষ্ট পাবো।"

আমরা কয়েকজন ভরতের কথা রেখেছিলাম। যতদিন সে শান্তি-নিকেতনে ছিল, আমরা সেই সেলুনে চুল কাটতে যাইনি। ষাটের দশকের গোড়ায় তার জামাইকে কাজে লাগিয়ে ভরত দেশে চলে যায়। তারপর তার কোন খবর পাইনি।

পান্থনিবাসের সামনে পানের দোকান ছিল শ্রীপতির। আগে উত্তরায়ণের রান্নাঘরে ছিল। রথীন্দ্রনাথ দেরাদুন চলে যেতেই শ্রীপতি পানের দোকান দেয়। তারপর রথীদা যখন আসতেন, তখন শ্রীপতি

পানের দোকানে ঝাঁপ ফেলে চলে যেত উত্তরায়ণের রসুইখানায়, হাতজোড় করে বলত, "এসে গেছি বাবুমশায়।" উত্তরায়ণে তখন বনমালীরা নেই, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই পেনসন নিয়ে বনমালী চলে যায় তার দেশে, ভদ্রকে। থাকার মধ্যে ছিল নাথু। ঘরদোর ঝাঁট দিত আর লম্বা লম্বা গল্প ছাড়ত। নেহরু যতবারই এসেছেন, তাঁকে একটি করে তাঁর গায়ের শেরোয়ানি দিয়ে গেছেন। তার ঘরে ছিল শেরোয়ানির একজিবিশন।

বনমালী যেমন রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে বাঁধা, মুনীশ্বর তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথের। ১৯২৬ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ মারা যান। তারপর বহুদিন বেঁচে ছিল মুনীশ্বর। প্রশান্ত চেহারা। মোটা সাদা গোঁফ। আমরা যখন ছাত্র, মুনীশ্বর হিন্দীভবনের পিয়ন। সকালে ডাকঘর থেকে চিঠি আনা ছিল তার প্রধান কাজ। তার ছেলে শঙ্কর কাজ করত সায়ান্স ল্যাবরেটরিতে। আর ছিল জংলা ও অভয়। কাজ করত কখনো ল্যাবরেটরিতে, কখনও রান্নাঘরে।

কালোর দোকান শান্তিনিকেতন এবং শান্তিনিকেতনের বাইরে কিংবদন্তীর মতো। ওই দোকানে বসে রাজা উজির মারেনি এমন লোক গত পাঁচ দশকে শান্তিনিকেতনে কম। আমরা একবার কালোকে সম্বর্ধনা জানাই। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এস এন রায় আই সি এস এবং মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মোহনলালদাই কালোকে নিয়ে ছড়া বাঁধেন—ছিল কালো, হল লাল: বলে গেল মোহনলাল। রায় সাহেব সম্বর্ধনা সমিতির প্রেসিডেন্ট, মোহনলালদা সেক্রেটারি এবং ট্রেজারার মন্টুদা—সুধীরময় ঘোষ। সেবারের পৌষ উৎসবে কালোর দোকানেই শাদা চাদর ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, মালা ইত্যাদিতে তাঁকে বরণ করা হয়। এস এন রায় সেই অনুষ্ঠানেই জানান, তিনি পৌষ-মেলায় এসে থাকেন বটে উত্তরায়ণে; তবে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার কালোর দোকানে। সেই উপলক্ষে দোকানে বসেই আমি গান

লিখেছিলাম, বিশ্বজিৎ সুর দিয়েছিল। পুরোটা মনে নেই, তবে দু-চার লাইন হচ্ছে এইরকম—"সবে মিলে কালো চল, কালোবরণ চায়ের ধরণ, কফির সনে ভেদ না র'ল" ইত্যাদি।

কালো মারা গেছে। সব কাগজেই সেই শোক সংবাদ ছাপা হয়েছিল। কিন্তু যা ছাপা হয়নি, সেটা এখানে বলছি। কালোকে সম্বর্ধনা জানানোর অল্প কিছু দিন পর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যান। সেই সময়ে একদিন দুপুরবেলা ফার্পোতে এস এন রায় মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। তিনিও গেছেন লাঞ্চ খেতে। আমাকে ডেকে বললেন, "দেখলে তো, মোহনলালটা হঠাৎ মারা গেল।" তারপর হাসতে হাসতে বলেন, "কালো সম্বর্ধনার সেক্রেটারি চলে গেল, এবার প্রেসিডেন্ট আমিও টুক করে চলে যাব।"

আমি বললাম, "কী যে বাজে কথা বলেন। আপনি এখনও ইয়ংম্যান।"

সেদিন লাঞ্চের পর বাইরে আরো কিছু কাজ ছিল। সন্ধ্যের পর আনন্দবাজার অফিসে ফিরেছি। খানিকবাদে রিপোর্টিং বিভাগ থেকে কে একজন বলল, "ইস্, এস এন রায় মারা গেলেন।"

এস এন রায় মারা গেলেন! আমি আঁৎকে উঠি। বলে কী! ফাজলামো নয় তো? না, সত্যিই। কিন্তু এ হয় কী করে? মাত্র পাঁচ ছ ঘণ্টার তফাতে এমন হতে পারে? আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না, আমার তখন মাথা ঘুরছে।



শিক্ষাভবন মানে কলেজ এলাকা তখন বোলপুর-শান্তিনিকেতন রাস্তার গায়ে। দ্বারিকের সামনে গন্ধরাজচক্রে বসত আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আড্ডা। আর পাশের নেবুকুঞ্জে পাওয়া যেত ডিম এবং চা বা কফি। দোকানের মালিক হরিপদদা। তার সহকারী পশুপতি। আমাদের হস্টেলের এবং কলাভবন ও সংগীত ভবনের ছাত্রদের যাতায়াত ছিল ওই দোকানে। আর নিত্য আসতেন পটলদা—জগদানন্দ রায়ের পুত্র ত্রিগুনানন্দ রায়। তাঁর ডাক নাম পটল বলে তাঁর ছোট ভাই সচ্চিদানন্দের ডাক নাম হয়ে যায় আলু। আবার প্রমথনাথ বিশীর ছোট ভাইয়ের নাম হয় ছন্দ মিলিয়ে শিশি। পটলদার তখন মাথার ব্যামো। দোকানে এসে কাপের পর কাপ চা খেয়ে যেতেন। আবার কখন সখন দেখা যেত, ভর দুপুরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে গুরু-পল্লীর দিকে হেঁটে চলেছেন।

হরিপদদার চায়ের দোকানের বড় আকর্ষণ ছিল ধারের সুবিধে। অসুবিধেও ছিল। আমরা ছ'জন মিলে হয়ত আড্ডা মারতে মারতে চা আর ওমলেটের অর্ডার দিয়েছি। যাবার আগে কোন একজন হয়ত বললেন—'হরিপদদা, আমার নামে লিখে রেখ।' হরিপদদা বাক্যব্যয় না করে ছ'জনের নামে ছটা ওমলেট আর ছটা চা খাতায় লিখে রাখত। মাস পেরোলে অনেক সময় খেয়াল থাকত না, সত্যিই কে খাইয়েছিল। হরিপদদা অনেকদিন পর টাকা চাইত আলাদা আলাদা ভাবে। অবশ্যি অনেকে ফাঁকিও দিত হরিপদদাকে। হরিপদদার একজন বড় খদ্দের ছিল তার একজন সমনামী—হরিপদ পুরকায়স্থ, দিনে অন্তত চল্লিশ কাপ চা খেত।

নেবুকুঞ্জ বাড়িতে থাকত সাতকড়িদা আর তার সহকারী বালক লক্ষ্মণ। ওরা দুজনে আমাদের ঘর ঝাঁট দিত, কলসিতে খাবার জল ভরে রাখত, ফাইফরমাশ খাটত। অনিলদাদের আড্ডা যখন বসত গন্ধরাজচক্রে, যখন গানের পর গানে ভেসে যাচ্ছে সারা এলাকা, তখন ডাক পড়ত সাতকড়িদার। যাত্রাগানের অভিনয় দেখাতে। সাতকড়িদা যৌবনে কোন এক যাত্রা দলে ছিল। সেই সব পার্ট তার মুখস্ত। তিন নম্বর আট নম্বর ছয় নম্বর ইত্যাদি বললেই কখনও কর্ণ, কখনও রুক্মিণী, কখনও রাবণের পার্ট বেরিয়ে আসত। সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী। আবার সাতকড়িদা যখন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে তার বাড়িতে চিঠি লিখতে বসত, সে এক প্রাণান্তকর দৃশ্য। আমরা প্রায়ই বলতাম, সাতকড়িদা চশমা নাও। সাতকড়িদা রেগে জবাব দিত—কেনে, চশমা লিব কেনে? কী হইছে আমার?

আমাদের হস্টেলে ছিল চল্লিশটি সীট। সেই প্রচণ্ড তাণ্ডব প্রলয় ভৈরব বাড়িতে দশটি করে। আর দ্বারিক বাড়িতে ছিল একক দুটি ঘর। একটিতে থাকতেন গুজরাতের খিমজি করানি আর অন্যটিতে রাজস্থানের রবীন্দ্রসিং ভাণ্ডারী। দুজনেই ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। চমৎকার দুটি ঘর। আমলকি গাছের ডাল জানালায় হাত বাড়ায়, দেহলির কোল ঘেঁসে ছুটে আসে বনপুলকের গন্ধ, হঠাৎ হঠাৎ ছুটে যায় কাঠবেড়ালি। পরে মোফাজ্জল হায়দর ও লোকনাথ ভট্টাচার্য ওই দুটি ঘরে থাকতেন।

আমাদের হস্টেল তখন জমজমাট। সবাই আমুদে, সবাই সপ্রতিভ। আমার সমসাময়িক অনেকেই নাম করেছেন পরবর্তীকালে। আমার রুমমেট থার্ড ইয়ারের মোফাজ্জল হায়দরকে বলা হত মুখোজ্জ্বল হায়দর বা উঁচু দর। এ নাম দিয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন —যিনি পান্-এর ব্যাপারে ক্ষিতিমোহন সেনের সমকক্ষ। হায়দার ঢাকা থেকে আই এ-তে প্রথম হয়ে ভর্তি হয় বাংলা অনার্সে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পরীক্ষায় আবার প্রথম। একজন

মুসলমান ছাত্রের প্রথম হওয়াও বোধহয় সেই প্রথম। ভাল কবিতা লিখত এবং শান্তিনিকেতন ছিল তার কাছে প্রাণের চেয়ে বেশি। ছোটখাট চেহারার এই অমায়িক বন্ধুটি অকালে প্রাণ হারায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আল বদরদের হাতে।

কবি হিসাবে পরে খ্যাতিমান হন তিনজন—আশরাফ সিদ্দিকি, লোকনাথ ভট্টাচার্য ও নবকান্ত বরুয়া। আশরফ আমার সহপাঠী। সত্যি ভাল কবিতা লিখত। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় ওর কবিতা বেরোয় প্রবাসীতে—'ট্রেনে যেতে দেখি পদ্মার পাড়ে কাশের ফুল।' সে বছর দেশে পূজা সংখ্যায়ও তার কবিতা বেরোয়, টাকা পায় পঞ্চাশ। আমরা ঈর্ষায় মরে গিয়েছিলাম। ছাত্রজীবনে ওর লেখা 'তালেব মাস্টার' সেকালে খুব নাম করেছিল। আশরাফ এখন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে লোকসাহিত্যের ডক্টরেট এবং ঢাকায় বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান।

লোকনাথদা ভাল গান গাইতেন, আবৃত্তি করতেন, গানে সুর দিতেন, কবিতা তো লিখতেনই। তার প্রথম বই 'আয়তি।' ছিলেন ভাটপাড়ার বামুন, এখন ঢাকঢোল বাজানো ফরাসী পণ্ডিত। ছিলেন সাহিত্য একাদেমিতে, পরে ন্যাশনাল বুক ট্রাসটের চেয়ারম্যান। নবদা ছাত্রজীবন থেকেই অসমীয়া সাহিত্যের দিকপাল। গদ্য পদ্য—দুটোতেই তাঁর হাত চলে। একাদেমি পুরস্কারও পেয়েছেন। প্রতি বছর একাডেমি পুরস্কার ঘোষণার পর আমি মিলিয়ে দেখি, আমার সমসাময়িক কতজন শান্তিনিকেতনী পুরস্কার পেলেন। যেমন ১৯৭৯-তে পেয়েছিলেন ওড়িয়ায় কুঞ্জবিহারী দাস, মনিপুরীতে বিনোদিনী দেবী ও বাংলায় মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতাদি আমার দু ক্লাস সিনিয়র, ছাত্রীজীবন থেকেই প্রতিভাময়ী, তখন থেকেই তার লেখায় হাত। বলতেনও খুব সুন্দর —সব কিছু পরিণত চিন্তার ফসল। মনে আছে বাচ্চাদের দিয়ে তিনি নিজের নাটক করিয়েছিলেন 'সাত ভাই চম্পা'।

সাধনা কর ছাত্রী অবস্থাতেই গল্প লিখতেন প্রবাসীতে। অরুণ বাগচিও ভাল কবিতা লিখত। হীরেন ভট্টাচার্যের সুন্দর হাত ছিল ছবি আঁকায় ও গল্প লেখায়। সব ছেড়ে দিল। রাধাবিনোদ সরকারের কবিতা তখনই বেরোত 'কবিতা' পত্রিকায়। কৃষ্ণ ঘাটোয়ানি এখন সিন্ধি সাহিত্যের দিকপাল। ওড়িয়াতে চিত্তরঞ্জন দাসও তাই। অজিত বিশ্বাস অনর্গল লিখত গল্প। নির্মল চক্রবর্তী ও রবি দাস লিখত চমৎকার প্রবন্ধ। 'সাহিত্যিকা' ছিল আমাদের সাহিত্যচর্চার প্রতিষ্ঠান। আমরা প্রত্যেকেই হাত পাকিয়েছি সাহিত্যিকায় লেখা পড়ে পড়ে। সেই পড়াটা অনেকের ক্ষেত্রেই বিফলে যায়নি। সাহিত্যিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল আলাদা আলোচনা চক্র। বকুলবিথীতে বা দ্বারিকের দোতলায় সাহিত্যের কত জিনিস নিয়েই না আমাদের জোর তর্ক হয়েছে। হস্টেলের বাইরে শুভময় ঘোষও ভাল লিখত। বিভাস সেন, সুধীর সেন, রবিন নাগও।

আমার ক্লাসে অনেক মুসলমান ছেলে ছিল। আশরাফ ছাড়া সুলতান আলম, মকবুলার রহমান, শেখ সাজ্জাদ আলি, মহম্মদ মহসিন ও মুস্তাকিম চৌধুরী। মুসলমান কথাটা লিখেই কানে লাগল। কে হিন্দু, কে মুসলমান বুঝতাম না। মুস্তাকিম বাংলাদেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা। কিছুদিন জাপানে ছিল রাষ্ট্রদূত। মুস্তাকিম আলিগড় থেকে আই এ পাশ করে এসে বলল, সে উর্দু আর ইংরাজি ছাড়া কিছুই জানে না। মেশেও কেবল কৃষ্ণ নায়ার চন্দ্রশেখর রাইয়া বিদ্যুৎ পাণ্ডে জিতেন্দ্র সিং ত্রিলোচন সেনাপতি (পরে ওড়িশ্যার এম এল এ) প্রমুখদের সঙ্গে। কিন্তু একদিন রাত্রে ভূতের ভয় দেখাতেই মাতৃভাষা বেরিয়ে গেল। দেখা গেল, ও বাঙালী শুধু নয়, সিলেটী বাঙাল। মকবুলার রহমান ছিল ভীষণ পড়ুয়া। বই পড়তে পড়তে জ্বরে পড়ত, আবার জ্বরে পড়ে পড়ে বই পড়ত। তবে সবচেয়ে চৌকস ছিল সুলতান আলম। ভাল গাইত, ছবি আঁকত, এসরাজ বাজাত, উপরন্তু সুদর্শন। মেয়েরা আড়ালে বলত—সুইট সুলতান।

কলেজে সমসাময়িক ছাত্রীরাও বিশিষ্ট। একালের নামী অভিনেত্রী অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা ছিলেন তিন বছরের সিনিয়র। তখন ভাল গাইয়ে হিসেবে তাঁর খুব নাম ডাক। মেয়েদের বেলায় দেখেছি, তিন তিনজন করে ঘোরার বাতিক ছিল আমাদের সময়। সুদর্শনা রায়—কল্যাণী দাস—মহাশ্বেতা ঘটক— একটি ট্রায়ো, জয়শ্রী চন্দ—অনসূয়া গুপ্তা—মাধুরী চৌধুরী (পরে উমা রায়) আর একটি। ঠিক একই রকম অনিতা সেন—মুকুল রায়—কাজরী দেবশর্মা (পরে কাজরীর বদলে বিজয়া সেন), হাসি মিত্র—নমিতা সেন—হরবক্স সোধি, সুসীমা—বাণী—ক্ষমা, গীতা দেব—গীতশ্রী দত্ত—অশোকা রায়, প্রমীলা রাও—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—প্রতিমা পাণ্ডে, মায়া দে সরকার —মাধবী মিত্র—ইরা মজুমদার, সুপ্রিয়া রায়—নীলিমা গুপ্তা—তনিমা সেন, বাণী তালুকদার—বাণী রাও—লীলা সুখতঙ্কর, সুনন্দা রায়— নন্দিতা দাস—চিত্রা পাল চৌধুরী, সুসীমা দাশগুপ্তা—বাণী ভঞ্জ— ক্ষমা গুপ্তা, শিবানী গুহ—পূরবী দত্ত—রঞ্জনা দাস—এই রকম আরকি। এঁরা প্রত্যেকেই পদবী পাল্টে হয় খ্যাতিমান পতির গৌরবে গরবিনী, নয় নিজেই খ্যাতিমতী। বাণী তালুকদার, এখন সেন, ভাল গান গাইত। সুনন্দা, মানে ছোটনের গলাও ভাল ছিল। এখনও গানের ব্যাপারে সে অক্লান্ত। নালিমা গুপ্ত (সেন) বাচ্চু নামেই পরিচিত। যেমন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মোহরদি। বাচ্চু আমাদের বিশেষ বন্ধু। ম্যাট্রিক পাশ করে সংগীত ভবনে ভর্তি হয়। সেখান থেকে আবার কলেজ। আমাদের সময়ে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল বিজয়লক্ষ্মী কৈরালা। পরে শান্তা পণ্ডিত। বিজয়লক্ষ্মী নেপালের বি পি কৈরালার ছোট বোন। বিয়ে হয়েছে এক পাক কূটনীতিবিদের সঙ্গে। বছর কয়েক আগে মেট্রোর সামনে দেখা। আমাকে দেখে 'অমিতদা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। একেবারে ভুলে যায় আমরা শান্তিনিকেতনে নেই।—এরা সবাই নানা ক্লাসের হলেও আমাদের বন্ধু। এদের কাউকে দেখলে মনে হয়, আপনজন কাছে এল। এইতো বছর কয় আগে দিল্লীতে হঠাৎ দেখা

হাসির সঙ্গে। হাসি ডেকে আনল লীলাকে। হাসির বাড়িতে আমরা তিনজন সকাল দশটা থেকে রাত দশটা কেবল পুরোনো শান্তিনিকেতনের গল্পই করলাম। তবু আশ মিটিল না। এই তো সেদিন মায়া এল ওয়াশিংটন থেকে। মেয়ের বিয়ে দিতে। ওকে বহুদিন পর পেয়ে আমাদের কী আনন্দ। সুবীর দাশগুপ্তের বাড়িতে আড্ডা হল। আমার ক্লাসের অনিতা, মুকুল. চিত্রা, সুনন্দা, নন্দিতা, বিজয়ারা তো এখনও আমার আত্মীয়ের চেয়েও বড়ো। এদের সঙ্গে দেখা হলে আমার বয়স কমে যায়। মনে হয়, এখনও বুঝি একসঙ্গেই পড়ি। অনিতা ও মুকুলের বিয়েতে আমি কন্যাযাত্রী হয়ে জামসেদপুর গিয়েছিলাম। আবার মুকুল ও নন্দিতা যখন অকালে স্বামী হারাল, মনে হয়েছিল—আমারও কেউ চলে গেলেন। প্রত্যেকেই সুগৃহিণী। অনেকে আবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিদিমা। ওদের চুলে পাক ধরলেও আমি তাদের এখনও সেই ষোড়শী সপ্তদশীই দেখি। অনিতাকে শুধু বন্ধুর মত ভালবাসতাম না, দিদির মত ভয়ও করতাম। আমার উপর অনেক গার্জেনি সে ফলিয়েছে, এখনও ফলায় এবং আমার ভালই লাগে।

শান্তিনিকেতনের সহশিক্ষা নিয়ে নানারকম সরস মন্তব্য আগেও শুনেছি, এখনও শুনি। সবাই এমনভাবে রসিয়ে ব্যাপারটা বলেন, যেন শালবীথি আর ছাতিমতলার দোলনায় দোলনায় একপাল মেয়ে দুলছে, আর ছেলেরা তাদের ধরতে হাত বাড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ধরে ফেলেও। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। কো-এডুকেশন থাকাতে ক্লাস ও ক্লাসের বাইরের জীবন নিশ্চয়ই সরস ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, হরদম বেলেল্লাপনা চলেছে শান্তিনিকেতনে। সত্যি কথা বলতে গেলে, অন্য অনেক জায়গার চেয়ে শান্তিনিকেতনে অসামাজিক মেলামেশা কম, সেই বললেই চলে। তার কারণও আছে। এক সঙ্গে খাওয়া বেড়ানো খেলা অভিনয় গান করা চলতে থাকলে দূরত্বের রহস্য কমে যায়, বরং বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মত নারী পুরুষ

সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খোয়াইয়ের দিকে একসঙ্গে একটু হেঁটে যাওয়া, খেলার মাঠে একটু গান শোনানো বা গান শোনা, যেমন পূজার ছুটি বা গরমের ছুটির মুখে 'সময় আমার নাই যে বাকি, শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে নাকি'—গাইতে গাইতে চলে যাওয়া কিংবা বড়জোর কোন এক দুর্লভ মুহূর্তে পলকের জন্যে সংগোপনে 'তব করতল মোর করতলে হারা'—আর যাই হোক, বৈধ বা অবৈধ প্রেম নয়। শুধু তাই নয়, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে অশালীন আচরণ বা অভব্য কথা বলার কোন অবকাশ থাকে না। তখন আশ্রমে রেডিও গ্রামোফোন বিশেষ ছিল না। পূর্বতোরণের উপর একটি আর একটি সুধীর রায়দার বাড়িতে ছিল। ক্রিকেটের রীলে শুনতে হলে দ্বিতীয় বাড়িতেই যেতাম। একবার কলেজ হস্টেলে কোথা থেকে যেন একটা গ্রামোফোন এল। সন্ধে থেকে রাত দশটা অবধি রেকর্ড বাজান হল। তারপর মনে হল, ইস্, এত সুন্দর সুন্দর গান তো ক্লাসের মেয়েদের শোনানো হল না। মাঝরাতে শ্রীভবনের সামনে খেলার মাঠে গিয়ে গ্রামোফোন বাজালাম—বাসনা, যদি মেয়েরা শুনতে পায়। পরদিন জিজ্ঞেস করলে ওরা বলল, শোনেনি। —কী আপশোস!

আজকাল শুনতে পাই, কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা নাকি একে অন্যকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। আমি সেই ১৯৪৪ সাল থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের তুই বলে ডেকে আসছি। অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অনিলদার কথা। কলেজের প্রিন্সিপাল অনিলকুমার চন্দ। শিলচরের বিখ্যাত চন্দ-ভ্রাতা চতুষ্টয়ের কনিষ্ঠ। তিনি নবাগত সব ছাত্রছাত্রীকে প্রতিবছর গোড়ার দিকে একটি মাত্র কথাই বলতেন—তোমরা সবাই ভদ্র পরিবার থেকে এসেছ। মনে রেখ, শান্তিনিকেতন একটি বৃহৎ পরিবার। একটি ভদ্র পরিবারে যা যা করা চলে, শান্তিনিকেতনেও তাই করতে পারবে। সেই সঙ্গে

বলি, পড়াশোনা, খেলাধুলা, নাচ, গান, ছবি আঁকা, অভিনয় সমান তালে করবে। 'রাখিও বল জীবনে রাখিও মনে আশা, বিপুল এ ভুবনে রাখিও ভালবাসা।'—অনিলদার সেই সব কথা আমি কোনদিন ভুলিনি।

এই অনিলদা ছিলেন আমাদের হীরো। তাঁকে আমরা ভালবাসতাম, ভয় করতামও। আমাদেরই কেউ কেউ আবার অনিলদা যখন প্রিন্সিপাল, তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিল, অনিলদার ভাল লাগা না-লাগা অনুযায়ী নিজের পছন্দ অপছন্দ ঠিক করত, আবার উনি যেই প্রিন্সিপাল পদ ছেড়ে চলে গেলেন, ওরাই আবার তাঁর সমালোচক হয়ে উঠল। এই-ই নিয়ম। সেই সময় অনিলদা বিশ্বভারতীর হর্তাকর্তাদের একজন। তবু সব সময় নজর থাকত আমাদের দিকে। হস্টেলে এসেও থাকতেন মাঝে মাঝে। ঈদের সময় মুসলমান ছাত্রদের বাড়িতে নিয়ে খাওয়াতেন। বন্ধুরা ফিরে এসে যখন সেই খাওয়ার সবিস্তার বর্ণনা দিত, কিচেনের খাবার খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত আমার মনে হত, হায়, কেন মুসলমান হয়ে জন্মালাম না। মনে আছে একবার পৌষমেলায় আমার সহপাঠী ও সহকর্মী কোট্টায়ামের রাজনকে দেখতে না পেয়ে হস্টেলে তিনি চলে যান। রাজন বলে, তাতে টাকা নেই বলে মেলায় যেতে পারছে না। অনিলদা আগেই আন্দাজ করেছিলেন। রাজনের পকেটে কুড়ি টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'গো, এনজয়।'

অনিলদার মুখে সব সময় লেগে থাকত একটা না একটা রসিকতা। খদ্দরের পাজামা পানজাবি আর সোলার হ্যাট বা তালপাতার টোকা পরে তিনি কোণার্ক থেকে হন হন করে আসতেন তাঁর অফিস দ্বারিক-বাড়ির এক তলায় আর কাজের ফাঁকে অধ্যাপকদের নিয়ে আড্ডা দিতেন সামনের গন্ধরাজচক্রে। ছাত্রদের প্রবেশ নিষেধ ছিল না সে আড্ডায়। এমন কি অনিলদার কেরানি ভুজঙ্গভূষণ মিত্র—আমাদের প্রিয় ভুজঙ্গদা ছিলেন সেই আড্ডায় শিরোমণি। কে প্রিন্সিপাল,

কে কেরানী—সেই ভেদ আমাদের মনে ছিল না। এখনও নেই। সেটাই শান্তিনিকেতনে আর একটি বড় শিক্ষা। পিকনিকে এক্সকার্সনে ভৃজঙ্গদা ছিলেন আমাদের অনিবার্য সঙ্গী। এখনও শুনতে পাচ্ছি, অনিলদার কোন এক রসিকতায় ভুজঙ্গদার হাসির জলতরঙ্গ। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়েছে গন্ধরাজচক্র থেকে নেবুকুঞ্জে, নেবুকুঞ্জ থেকে দেহলিতে।

অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যরাও ছিলেন আমাদের কাছের। হীরেনদা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন স্কুলে পড়াতেন, কিন্তু আমাদেরও ইংরেজি ক্লাস নিতেন। চমৎকার পড়াতেন। তাঁর একটা মুদ্রাদোষ ছিল, কথার ফাঁকে ফাঁকে "ইজনট্ ইট" বলা। আমরা গুণতাম। কোনদিন দেড়শ, কোনদিন একশ সাতার। এই হীরেনদা ক্লাসের ভিতরে বা বাইরে যা বলতেন, আমরা গোগ্রাসে গিলতাম। গলায় চাদর ছোটখাট্ট এই তেজী মানুষটি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মল্লিনাথ। হীরেনদার একটা আড্ডার দল ছিল। অজিনদা, রণজিৎ রায়দা, মন্টু ঘোষদা, অমিয়দা, রণজিৎ মুখার্জিদা, বীরুদা (অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর), ললিতদা, ধনপতিদা ছিলেন সেই আড্ডায়। অজিনদা তাঁর পুত্রের বন্ধুদের নিজের বন্ধু বলে গ্রহণ করার মন্ত্র জানতেন। পরে বড় হয়ে আমরাও সেই আড্ডায় প্রবেশাধিকার পেয়েছি। এই আড্ডা থেকেই শুরু হয় ইন্দ্রজিতের খাতা। সুনীলচন্দ্র সরকারও পড়াতেন ইংরেজি। দারুণ কবিতা লিখতেন—কিন্তু বই একখানাই, মিলিতা। তিনি নাটক লিখতেন, গান গাইতেনও। ডঃ আরনসন ঢাকা চলে গেলে তাঁর জায়গায় প্রথমে আসেন অজিত ঘোষ ও দিলীপ সেন। তারপর শিশিরদা—ডঃ শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ ও হাক্সলিভক্ত। ভাল পড়াতেন। আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট ও টেবিলটেনিস খেলতেন। বাংলায় ছিলেন সুখময় চট্টোপাধ্যায় ও উপেনদা—উপেন্দ্রকুমার দাস। উপেনদা সেই ছাত্র হয়ে আশ্রমে এসেছিলেন, তারপর থেকে গেলেন আজীবন। তাঁর সারা জীবনের

পরিশ্রমের ফল তন্ত্রের উপর একখানা প্রামাণ্য বই। সংস্কৃতে ছিলে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমাদের কাব্যজিজ্ঞাসাও পড়িয়েছিলেন খু সুন্দরভাবে। বাংলা পড়াতেন প্রবোধদাও—প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবোধদা তখনই রবীন্দ্র অধ্যাপক। বসতেন উত্তরায়ণে। প্রবোধদ উত্তরায়ণ থেকেই আসতেন ক্লাস নিতে। তিনি আমাদের রবীন্দ্রনা পড়াতেন, ছন্দ পড়াতেন। লাল টুকটুকে রং—পাকা আমটির ম চেহারা, ধুতি-পাঞ্জাবি ছাতা নিয়ে হেলতে দুলতে আসতেন পড়াতেন অতি সরস করে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র, তাই তাঁর সব ব্যাপারে ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। এমন অধ্যাপকে কাছে পড়তে পারা সৌভাগ্য। প্রবোধদার সহকারী গবেষক ছিলে অমিয়দা—অমিয়কুমার সেন। প্রবোধদা যদি রবীন্দ্র-চেয়ারে, তবে অমিয়দা রবীন্দ্র-মোড়ায়। তিনিও আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন অমিয়দা ছিলেন আমাদের বন্ধুর মত। এমন অমায়িক ছাত্রবৎস আশ্রমিক কদাচিৎ মেলে। তাঁর অকাল মৃত্যু আমরা আজও ভুলতে পারিনি।

অর্থনীতি পড়াতেন খগেন ভট্টাচার্য। পড়াতেন ভাল, তবে তা নজর বেশি ছিল সাহিত্যচর্চায়। ডঃ মুখার্জি ও অনিলদা পড়াতে পলিটিক্স। জার্মান আরনসনকে ডাকা হত আরনদা, কিন্তু বাঙালী ড মুখার্জিকেই কেউ দাদা ডাকত না।—অন্য সবাই দাদা। ডঃ বিনয় গোপাল রায় পড়াতেন দর্শন। পরে আসেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তিনি আসার পর সাহিত্যিকার অনুষ্ঠান-সম্পাদক বিমলানন্দ ঘোষকে বলা হল, টাটা বিল্ডিংয়ে একজন বড় ওস্তাদ এসে উঠেছেন লখনৌ থেকে। তাঁকে এনে গান গাওয়াও। তবে তিনি এমনই বিনয়ী গাইতে বললে বলবেন, আমি গান জানিনা। বিমলানন্দ তকখুনি গিয়ে অনুরোধ করতেই আইয়ুব সাহেব বলেন, না, না, না। বিমলানন্দ যতই বলে—কী যে বলেন ওস্তাদজি, আপনাকে গাইতেই হবে আইয়ুব সাহেবের অস্বস্তি, অবশেষে বলেন, বাথরুমে যাওয়ার ম

গানের বিদ্যেও আমার নেই। ফিজিক্সে কিছুদিন ছিলেন ডঃ সমর ঘোষাল, পরে আসেন প্রবাসজীবন চৌধুরী। প্রবাসদা শিলঙে ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, শান্তিনিকেতনে এলেন ফিজিক্সের অধ্যাপক হয়ে, পরে প্রেসিডেন্সিতে গেলেন ফিলজফির হেড হয়ে। তাঁর অকাল মৃত্যুও বিরাট ক্ষতি। প্রবাসদা গল্প লিখতেন, আড্ডা মারতে ভালবাসতেন, গান শুনলে পাগল হতেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যও মাঝে মাঝে ফিজিক্স ক্লাস নিতেন। অঙ্কে ছিলেন সত্যেন ঘোষাল—তিনি পরে বাংলার অধ্যাপক ও গবেষকরূপে নাম করেন। সত্যেনদার পর আসেন প্রাণকুমার ঘোষ। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে সমরশিক্ষা চালু করার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ প্রচুর। কেমিস্ট্রিতে ছিলেন প্রথমে শিশির সিংহ, পরে পরেশদা—পরেশ দাশগুপ্ত। বোটানিতে কানাইদা—কানাইলাল মুখার্জি। সৌমিত্রদা—সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত পড়াতেন সিভিক্স। ডঃ মুখার্জি চলে যাবার পর। তাঁরও কবিতার বই আছে। ভাল লিখতেন। আই এ পরীক্ষার পর হাসি মিত্র তাঁকে বলল, সৌমিত্রদা, আমরা তো আর গাছের তলায় ক্লাস করব না। সৌমিত্রদা ভারি গলায় বললেন, "তাহলে কি এখন গাছের উপরে ক্লাস করবে?" সৌমিত্রদা বিশেষ ভুল বলেন নি। অনেক সময় দেখা গেছে, খগেনদা তাঁর ইকনমিক্সের অনার্স ক্লাস নিচ্ছেন গাছের উপর। তিনি এক ডালে, ছাত্র দুজন অন্য ডালে। খগেনদার পর অর্থনীতিতে আসেন সুবিমল পাল।

কলেজের অধ্যাপক-কর্মীদের কথা বলার সঙ্গে যদি রাণীদির কথা না বলি, তাহলে সব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাণী চন্দ প্রিন্সিপালের স্ত্রী। কিন্তু সেটাই তাঁর বড় পরিচয় ছিল না আমাদের কাছে। আমরা ডাকতাম রাণীদি, কিন্তু আসলে ছিলেন রাণীমা। সুহাসিনী সুভাষিণী রাণীদি আমাদের পিকনিক এক্সকার্শন আউটিংয়ে ছিলেন কর্ত্রী, তেমনি আমাদের হস্টেলের সুবিধা অসুবিধার দিকে ছিল তাঁর পুরো নজর। ঘর-সংসার, ছবি আঁকা, বই লেখা নিয়ে এত ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু তাঁর

বাড়িতে ছিল আমাদের অবারিত দ্বার। যেন আমাদেরই বাড়ি। রাণীদির মমতাময় স্নেহময় সান্নিধ্য আমাদের অনেকেরই ছাত্রজীবনের সম্পদ।

তাছাড়া আরও তিনজন অধ্যাপকের কথা মনে পড়ছে। তাঁরা মাঝে মাঝে আমাদের পড়াতেন। ইংরেজ-মহিলা মারজারি সাইকস, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও গুরুদয়াল মল্লিক। মল্লিকজি ছিলেন আত্মভোলা সাদপুরুষ। সাড়ে চার ফুট চেহারায় লম্বা কাচা পাকা দাড়ি—যেন সেভেন ডোয়ার্ফের একজন। থাকতেন কলাভবনের হস্টেলে এক মাটির ঘরে। সেই ঘর থেকে তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের উদাত্ত ভজন অনবরত ভেসে আসত। তাঁর বাড়ি ছিল পেশোয়ার, তাই কপট ক্রোধ দেখিয়ে প্রায়ই বলতেন, "আমার কথা না শুনলে ঘাড় মটকে দেব। জানো তো, আমি পাঠান।"

তখন পাঠভবনে অর্থাৎ স্কুলে ছিলেন কয়েকজন নাম করা শিক্ষক। অধ্যক্ষ তখন বিভূতিভূষণ গুপ্ত—'বেড়াল ঠাকুরঝির' লেখক এবং যিনি আদি আশ্রমে ছিলেন প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে বুধবার কাগজের সম্পাদক। বিভূতিদার পরে তনয়দা কিছুদিন ছিলেন অধ্যক্ষ, তারপর গোপালদা—গোপাল চাটার্জি। নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী অর্থাৎ গোঁসাইজি ছিলেন অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে দিকপাল। গালে ছুঁচলো দাড়ি, নীল কাঁধব্যাগ, গেরুয়া ফতুয়া, নীল পাজামা—এই ছিল তাঁর চেহারা। আমরা আড়ালে বলতাম ডি সি লাহার বিজ্ঞাপন। গোঁসাইজি এমনিতে ভারীক্কি মানুষ। কিন্তু কোন গানের অনুষ্ঠান হলে খঞ্জনি বা খমক বাজাতেন। অভিনয় করতেনও ভাল। তনয়দা অর্থাৎ তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক। তনয়দার ইংরেজি ক্লাস করিনি বলে আমার আক্ষেপ ছিল। যারা নানা সময়ে তাঁর ছাত্র ছিল তাঁদের একটু বাড়তি গর্ব ছিল। এখন পাঠভবনের ছেলেমেয়ের লেখা নিয়ে বিশ্বভারতী 'আমাদের লেখা' একটা বার্ষিক সঙ্কলন বের করে। প্রথম প্রথম

তনয়দা নিজের খরচাতেই ছাপাতেন ও বিলোতেন। তনয়দা প্রতি বছর পৌষমেলায় একদিন নানা সময়ের তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পিকনিকে যেতেন। আমি যেতে পারতাম না বলে দুঃখ হত। পরে অবশ্য তনয়দার সঙ্গে আমারও ভাব হয়েছিল। পুরানো লাইব্রেরির পাশে সেগুনতলায় ওর সঙ্গে বসে গল্প করেছি ও ধমক খেয়েছি। তনয়দার ধমক না খেলে শান্তিনিকেতনবাসই বৃথা। তনয়দাকে কোন কিছু বললেই প্রথমে বলতেন—'তা নয়।' তারপর নতুন একটু কিছু বলতেন। সব কথার প্রতিবাদ করতেন বলেই আড়ালে তনয়দাকে বলতাম 'তা—নয়দা'। নামটা অমিয়দার দেওয়া। ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে, খেলার মাঠে তনয়দা ছিলেন ছাত্রদের ফ্রেণ্ড ফিলজফার গাইড। মুখে চুরুট, কাঁধে ব্যাগ, পায়ে সাইকেল—এই হলেন তনয়দা। ব্যাগে থাকত ছোট্ট ডিক্সনারি আর লেক্সিকান খেলার কার্ড। আর কিছু টফি। কাউকে বকলে টফি দিতেন মান ভাঙাতে। তনয়দা ভাল ব্যাডমিন্টন খেলতেন। একটি শট মিস করলেই বলতেন, দেখলে তো, ইচ্ছে করেই মিস করলাম তোমাদের দেখাতে। ভুল স্টেপ দিলে এমনি হবেই। তনয়দা লেফট আউটে ফুটবল খেলতেন প্রৌঢ় বয়সেও। নিরঞ্জনদা ছিলেন গণিতে, কাশীনাথদা পড়াতেন বিজ্ঞান, নলিনীদি বাংলা। পাঠভবনে আর ছিলেন নির্মলদা—নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেকালের নামকরা কবি, যার বিখ্যাত বই 'আকাশগঙ্গা'। নির্মলদা খুব ভাল আবৃত্তি করতেন। তখন আবৃত্তিতে নাম ছিল তিনজনের—নির্মলদা শুভময় ও সুসামার।

সুধীরচন্দ্র কর কোন ভবনে পড়াতেন না বটে, তবে তাঁর উপস্থিতি ছিল সর্বত্র। তিনি গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খদ্দরধারী মুখচোরা মানুষ, ভাল কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন। ভুবনডাঙ্গার লোকদের নিয়ে তাঁর একটা গানের দলও ছিল। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীও ছিলেন তখন। অফিসে কাজ করতেন, সাহিত্যিকায় প্রবন্ধ পড়তেন। সেকালের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিলও

আশ্রমে থাকতেন, তবে পড়াতেন না। ঠিক এই রকম ছিলেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক হিমাংশুপ্রকাশ রায়। সেবকদা—অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন বিজলি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। উত্তরায়ণে ঠাকুর এস্টেটের দেখাশোনা করতেন অন্নদা মজুমদার। আর ছিলেন দুই রামবাবু—একজন উত্তরায়ণের উদ্যানের নজরদার, অন্যজন অন্য নানা কাজের।

আমরা যখন কলেজে, তখন স্কুলে নিচের ক্লাসে পড়ত—অমর্ত্যকুমার সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তরা। অলোক তখন থেকেই পরিচিত কবি। গান গাইতও খুব সুন্দর। রোগা লাজুক প্রকৃতিপ্রেমী বন্ধু বৎসল। অমর্ত্য আর অলোক মিলে 'স্ফুলিঙ্গ' নামে একটি ভাল কাগজ বের করেছিল। অমর্ত্য কথাবার্তায় ছিল চৌকস, কিন্তু সে যে দিগ্বিজয়ী অর্থনীতিবিদ হবে আমরা কখনও ভাবিনি। আই এস সি যখন পড়ে, আমরা ভেবেছিলাম পাটনা থেকে ফার্স্ট হয়ে আসা দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ই হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম। কিন্তু ১৯৫১ সালে পরীক্ষার পর দেখা গেল অমর্ত্য প্রথম, দীপঙ্কর দ্বিতীয়। তারপর তো অমর্ত্যর জয়যাত্রা। ও ক্ষিতিমোহন সেনের দৌহিত্র, আমাদের সকলের গর্ব। এখন বড় সরকারী অফিসার স্কুলের কল্যাণ দাশগুপ্তও ভাল কবিতা লিখত, ভাল লিখত বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, দীপেন দত্ত, ইন্দ্রাণী রায়, অজয় গুহ, আভাস সেন, সুহোত্র ঘোষ, জয়িতা চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী চৌধুরী, মিষ্টুনি রায়। ওরা কিন্তু আর লিখল না পরে। স্কুল থেকেই প্রতিভাবান ছেলে গুজরাতের অঞ্জন শুক্ল। কলেজে যখন গণিতের ছাত্র, তখনই সিম্বলিক লজিকে নতুন থিয়োরি উপহার দিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগায়। খ্যাতনামা দার্শনিক কালিদাস ভট্টাচার্যের মতে, দর্শনে অঞ্জনের মত জিনিয়াস গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতে জন্মায়নি। সে ব্যাখ্যাকার মাত্র নয়, নতুন নতুন সূত্রের জন্মদাতা।

একবার একটি মেয়েকে নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন

নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় অনিল দে। বললেন, আমার ভাগ্নি। মেয়েটির নাম মৃদুলা গুপ্ত। খেলার মাঠে খুব মারামারি করত ছেলেদের সঙ্গে। বছর কয় পরে দেখি, এই মেয়েটিই সিনেমার অনুভা গুপ্তা।

বলতে ভুলে গেছি, তখন আমরা সবাই নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতাম। আর একদল ছাত্র বিশ্বভারতী কোর্সে আলাদা পড়ত। সেই কোর্সটা অনেক জীবন্ত ছিল। প্রশ্নপত্র ও উত্তরের ধারাও ছিল অন্যরকম। অবাঙালী ছাত্ররাই এই কোর্স বেশি নিত। গোপাল রেড্ডি রামচন্দ্রণ প্রমুখ এই কোর্সের ছাত্র, প্রথম ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলি। দু'একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিশ্বভারতী কোর্সের ডিগ্রী তখন স্বীকৃত ছিল না। স্বীকৃতি পেল ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাওয়ার পর।

অধ্যাপক ও কর্মীদের আমরা দাদা ডাকতাম। তাঁরা সে ডাকের মর্যাদাও দিতেন। তাঁদের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক ছিল ক্লাসের বাইরেই। যখন তখন বাড়ি যাওয়া, একসঙ্গে খেলা, বেড়ানো, আড্ডা মারা—সব কিছুই চলত। কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধা করতে বা যোগ্য মর্যাদা দিতে কখনও ভুলিনি। আড্ডা কথাটা সগৌরবে বারবার উল্লেখ করছি বলে কেউ যেন ভুল না বোঝেন। আমাদের আড্ডায় ফাজলামির জায়গা ছিল না। ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক মিলে কিংবা আলাদা আলাদা ভাবে নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম, অনেক কিছু শিখতাম। বুদ্ধির খেলা খেলতাম,—ক্যাটিগরি ওআড মেকিং অ্যাকটিং শারাও ইত্যাদি। হীরেনদা বলতেন, আসল ইউনিভার্সিটি তো কালোর দোকানের আড্ডায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। অনেকে বলেন, শান্তি-নিকেতনের ছেলেরা নাকি আনপ্র্যাকটিক্যাল হয়। সংসার সমরাঙ্গনে পরাস্ত হয়। তাই শান্তিনিকেতন হল শুধু মেয়েদের জায়গা। বাজে

কথা। আমাদের আগেকার বা আমাদের সময়কার সবাইকেই লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে বাইরের জগতে। কেউ অধ্যাপক, কেউ পুলিশ অফিসার, কেউ সাংবাদিক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ রাজনীতিবিদ, কেউ উচ্চপদের রাজকর্মচারী, কেউ বিজনেস একজিকিউটিভ। জীবন সঙ্গে বিফল এমন কাউকে তো বিশেষ দেখি না। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা 'মেয়েলি' বলেও দুর্নাম আছে। ওটাও গাল গল্প। আমাকে এবং আমার চেনাজানা কাউকেই কেউ কোনদিন মেয়েলি বলেনি। বরং উল্টোটাই বেশি সত্যি।

শান্তিনিকেতনে রসিকতার চর্চা আদিকাল থেকেই। তাই কেউ ভাল না মন্দ জানতে জিজ্ঞাসা করা হত, "লোকটা রসিকতা বোঝে তো? হাসতে জানে তো?" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সরস কথার রাজা। প্রতি কথায় রস। তার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। কথায় কথায় 'পান'। ক্ষিতিমোহনবাবুর বংশগত পেশা ছিল কবিরাজী। তাই তাঁকে একজন প্রশ্ন করেন, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজী করলেও তো পারেন। তিনি হেসে জবাব দেন—"কবিরাজী করার ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু কবি রাজী হলেন না।" শিল্পী মুকুল দে-র কী একটা কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আরে মুকুল ভাল হইব কী কইর্যা, মুকুলের মূলের মাঝখানেই যে 'কু'।" ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী কিরণবালা সেনকে সবাই বলেন ঠানদি। তিনি কোন এককালে ঠাকুরদার পার্ট করেছিলেন, তাই তাঁর স্ত্রী ঠানদি। ক্ষিতিমোহনবাবু শক্তসমর্থ সুপুরুষ। ঠানদি ছোটখাট রোগা। এই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"বাইরে রোগা, ভিতরে দা-রোগা।" এই হলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। প্রবোধচন্দ্র সেনও ছিলেন পানিং-এ ওস্তাদ। প্রবোধদার পরেই অমিয়দা। আমাদের বন্ধু সুনীল সেন কারো কথা শোনে না বলে অমিয়দা তার নাম দিলেন 'শুনিলনা সেন।'

অবনীন্দ্রনাথ তখন আচার্য। আমাদের সময় দু-চারবার এসেছেন। শিশু-বিভাগের ছেলেমেয়েদের গল্প বলতেন, কলাভবনে যেতেন এবং

একবার আমাদের সাহিত্যিকায় পৌরোহিত্য করেন। মাঝে মাঝে হুইল চেয়ারে বেড়াতে বেরোতেন আশ্রমে। তাঁর কথা আদ্ধেক বলতেন, আদ্ধেক বোঝাতেন হাতের আঙুলের ভাষায়। সবাই বুঝত। হুইল চেয়ারে বেরোতেন প্রথম চৌধুরীও। সঙ্গে থাকতেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। বীরবল তখন অসুস্থ। কথাবার্তা খুব কম বলতেন। অনবরত সিগারেট খেতেন। বিজয়া সম্মিলনীর চাঁদা আনতে গিয়ে একবার 'পুনশ্চ' বাড়িতে ওঁর সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে কী মুশকিল। উনি টানতে পারেন না, সিগারেটও জ্বলে না। পরে ইন্দিরাদেবী এসে আমাকে বাঁচান। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ওরা দুজন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতন চলে আসেন। ইন্দিরাদেবী—অর্থাৎ সকলের বিবিদি—ছিলেন দীর্ঘজীবী, ছিলেন তখনকার শান্তিনিকেতনের আশ্রম জননী। আমাদের মত সামান্য মানুষকেও তিনি স্নেহ করতেন। চেহারায় কথাবার্তায় অভিজাত। যেমন রূপবতী, তেমন গুণবতী। মনে আছে, তিনি ঘড়ি পরতেন শাড়ির সঙ্গে বুকের কাছে ব্রোচের আকারে।

বিবিদির মতই আর এক অভিজাতা—প্রতিমা দেবী, সকলের বৌঠান। অসাধারণ রূপসী। শুধু উত্তরায়ণ নয়, গোটা শান্তিনিকেতনের গৃহকর্ত্রী। নাটক করানোর সময় তাঁর ধারণার অনুরূপ। আমি যাওয়ার পর তিনি প্রথম নাটক করান ডাকঘর। উত্তরায়ণের বারান্দায় হয়েছিল, অমল সেজেছিল প্রবীর গুহঠাকুরতা এবং সুধা মঞ্জুলা দত্ত। সেই অভিনয় কখনও ভুলব না। আমাদের ক্লাসের অজিত বিশ্বাস ও শুভময় ঘোষ এই নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল বলে তখন ওদের একটু সমীহ করতেও শুরু করেছিলাম।

কবি-কন্যা মীরা দেবী এবং কবি-দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী আশ্রমের কর্মী হিসাবে যুক্ত না থাকলেও সব সময় তাঁদের আশ্রমে দেখা যেত। সর্বোপরি ছিলেন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ। আর সচিব সুরেন্দ্রনাথ কর। চুপচাপ ভালমানুষ, নন্দলালের পর

কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। নাটকে গানে খেলাধূলায় তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। উদয়ন সমেত শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাড়ির স্থপতিও সুরেনদা। আর রথীন্দ্রনাথ চোখের আড়াল থেকে সব কাজ চালাতেন দক্ষতার সঙ্গে। দিনের অধিকাংশ সময় কাটত তাঁর গুহাগৃহে। কাঠের কাজ করতেন, বাগানে নতুন রূপ দিতেন, পারফিউম বানাতেন, ছবি আঁকতেন। হাফহাতা ধবধবে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে এবং মুখে দামী সিগারেট দিয়ে তিনি হয় ফাইল দেখছেন, নয় নিজের কাজ করছেন। রথীদা খুব কম কথা বলতেন। দেখলেই মনে হত লাজুক। অথচ চলনে বলনে কী অভিজাত। রবীন্দ্রনাথের পুত্র না হলে তাঁর খ্যাতি আরও ছড়াত, তিনি আরও স্বীকৃতি পেতেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর তিনি হন প্রথম উপাচার্য। এমন দক্ষ ও সার্থক উপাচার্য আর কেউ হন নি। ১৯৫৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়ার পরই তো বিশ্বভারতীর ক্রমশ অন্যরূপ।

৪

আগেই বলেছি, গোটা শান্তিনিকেতন তখন এক পরিবার। ভবনে ভবনে ফারাক নেই। কোন অনুষ্ঠানের পর কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আশ্রমে ফেরার সময় আমরা যখন গলা চড়িয়ে গাইতাম আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন,' মনে হত স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এইখানে, তবে এইখানে। আমাদের ক্লাসের আগে উপাসনা ও প্রাতরাশ। উপাসনা মানে বৈতালিক। এক এক সপ্তাহ এক একটি ভবনের উপর ভার থাকত। ওঁ পিতা নোহসি মন্ত্র শুরু করত পাঠভবনের ছেলেমেয়েরাই। তারপর গান। পুরানো লাইব্রেরীর বারান্দার সামনে আমরা লাইন বেঁধে দাঁড়াতাম। রোজ সকালে বৈতালিকের সময় লাইনের বাইরে তিনদিকে তিনজন দাঁড়াতেন নিবিষ্ট মনে। খেলার মাঠ পেরিয়ে চৈতীর সামনে সুরেন করদা, গুরুপল্লী থেকে এসে বেণুকুঞ্জের কাছে গোঁসাইজি এবং কোণার্ক থেকে হন হন ছুটে এসে লাইব্রেরি-বাড়ি আর প্রাককুটিরের মাঝখানে অনিলদা। আর রোজ আসতেন মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু। আমি লেট রাইজার। কোনদিন দেরি হলে হস্টেল থেকে ছুটতাম। ততক্ষণে ওঁ পিতা নোহসি মন্ত্র শেষ, গান শুরু হয়েছে—'প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি।' আহা, একটি গানেই সকালটা সুমধুর হয়ে গেল।

দুপুর এগারোটায় মধ্যাহ্নভোজ। বিকেল আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা ক্লাস। অনার্স ক্লাস কিংবা প্র্যাকটিক্যাল। যারা অন্য ভবনে নাচ গান ছবি আঁকা বা বিদেশী ভাষা শিখতে চায়, তার জন্যেও নিখরচায় ব্যবস্থা ছিল বিকেলে। একটি ছাত্র কলেজে ক্লাস করে অনায়াসে সেতার, চিত্রাঙ্কণ ও জার্মান ভাষা শিখতে পারত। টিফিনের পর খেলা, বেড়ানো—যা খুশি। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আবার

হস্টেলবন্দী। পাঠভবনের ছেলেরা করত আবার সান্ধ্য উপাসনা। তারপর পড়াশোনা, নয় নাটকে বা সাহিত্যসভায় আহ্বান। রাত সাড়ে আটটায় খাওয়া দাওয়ার পর দু-চারজন ডানপিটে ছাড়া বাইরে কেউ বিশেষ বেরোতো না। হস্টেলের মেয়েরা তো নয়ই। ন'টার পর শ্রীভবনের বাইরে যাবার অধিকার কারও ছিল না। তখন টিমটিমে বিজলি আলো ছিল এবং রাত দশটার পর নিভিয়ে দেওয়া হত।

আশ্রমের সব কাজ চলত ঘণ্টার বৈচিত্র্যধ্বনিতে। পাঠভবনের একজন ছাত্র পালা করে বাজাত ঘণ্টা—যেটি ছিল সিংহসদনের শীর্ষে। তার হাতে থাকত টেবিল ক্লক। সময়মত সে নানারকম ঘণ্টা বাজাত। কখনও এক দুই, কখন তিন দুই, কখনও দুই তিন। এই বৈচিত্র্য-ধ্বনিতেই বুঝে নিতে হত কখন কী করতে হবে। চারটা করে ঘণ্টা বাজালেই বোঝা যেত কোন অনুষ্ঠান। পাঁচটা করে বাজলে বিপদ। কোথাও আগুন লেগেছে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনে পড়ে, পাঁচটা পাঁচটা ঘণ্টা বাজলেই সর্বাগ্রে হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়তেন উপেনদা। পাঠভবনের ছাত্ররা শুধু এই দায়িত্ব নয়, আরও অনেক কিছুর ভার নিত। ছাত্র স্বরাজ বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল ওদের মধ্যে। আদ্য মধ্য ও শিশু—এই তিন বিভাগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিল নির্বাচিত ক্যাপটেন। ক্যাপটেনরা ছিল সর্বেসর্বা। ক্যাপটেনের নির্দেশ না মানলে শাস্তি নিতে হত মাথা পেতে। ওদের আশ্রম-সম্মিলনীতে শুধু নিত্য কাজকর্মের যাচাই নয়, বিচারসভাও বসত। ছাত্ররাই সব।

বুধবার শান্তিনিকেতনের ছুটি। সেদিন সকাল আটটায় হত উপাসনা। উপাসনা পরিচালনা করতেন ক্ষিতিমোহন সেন। একটু বাঙাল টানে কী সুন্দর ভাষণই না তিনি দিতেন! বুধবার বুধবার পাঠভবনের ছেলেরা ধুতিপাঞ্জাবি আর মেয়েরা শাড়ি পরে মন্দিরে যেত। অন্য অনুষ্ঠানের সময়ও ক্ষিতিমোহনবাবু মন্দিরে উপাসনা

করাতেন। নববর্ষ, বর্ষশেষ, বাইশে শ্রাবণ, পৌষ উৎসব, বুদ্ধের জন্মদিন, মহম্মদের জন্মদিন, খৃষ্টের জন্মদিন—পরিপূর্ণ সেকুলার অনুষ্ঠান। সংস্কৃত মন্ত্র আর রবীন্দ্রসংগীতে শ্রদ্ধা জানানো হত মহাপুরুষদের। বড়দিনের সন্ধ্যায় মন্দিরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ইংরেজি ক্রীসমাস ক্যারলের সঙ্গে সংস্কৃত মন্ত্র ও বাংলা রবীন্দ্রসংগীত এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করত। আর পৌষ উৎসবের উপাসনার জন্যে তো আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম। মন্দিরের ভিতর সিঁড়ি ছাপিয়ে চারদিকে লোক। সবাই ধুতি পাঞ্জাবি আর শাদা শাড়ি পরা। ক্ষিতিমোহনবাবু ধীরে এসে আচার্যের আসনে বসলেন, ওঁ পিতা নোহসি মন্ত্রের পর মন্দির গম গম করে উঠল, পাখোয়াজ মন্দিরা এসরাজের সঙ্গে গম্ভীর সমবেত সংগীতে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সাতুই পৌষের উপাসনা সবপ্রথম চলে যায় মন্দির থেকে ছাতিমতলায়।

খেলাধূলার দিকে বিশেষ নজর ছিল সকলের। বিশেষ করে অনিলদা ও সুরেন করদার। এই সম্পর্কে একটা ঘটনা বলি। যুক্তফ্রণ্টের একদা মন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য যখন ইংরেজির অধ্যাপক পদে ইনটারভিউ দিতে যান, বোর্ডে ছিলেন অধ্যক্ষ হিসাবে অনিলদা। জ্যোতিদা ইংরেজি সাহিত্যের নানা ব্যাপার ঠোঁটস্থ করে এসেছেন সবাইকে ইমপ্রেস করতে। কিন্তু অনিলদা প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী কী খেলা জানেন? ফুটবল না ক্রিকেট—কোনটায় আপনার আগ্রহ বেশি?" জ্যোতিদার মাথায় হাত। ক্যারাম আর লুডো ছাড়া কোন প্রকার খেলাধূলায় তাঁর দক্ষতা নেই। আমতা আমতা করে তাই জবাব দেন, "আগ্রহ আছে, পরে সব শিখে নেব।" ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বলে জ্যোতিদা অবশ্য চাকরিটা পেয়ে যান।

জ্যোতিদা এবং অশোকদা—অশোকবিজয় রাহা ১৯৫১ সালে অধ্যাপক হয়ে আসেন এবং শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে মিশে যান। জ্যোতিদা রাজনীতিতে কতটা পাকা জানি না, অধ্যাপনা

আড্ডা এবং অভিনয়ে ছিলেন পয়লা নম্বর। তিনি আমাদের দিয়ে মুক্তধারা অভিনয় করিয়েছিলেন; করিয়েছিলেন বার্ণার্ড শ'র অ্যানড্র ক্লিস অ্যাণ্ড দি লায়ন। অশোকদা জাত কবি, মাটির মানুষ। সব সময় তিনি বলতেন, "আনন্দম আনন্দম।" সত্যিই তিনি ছিলেন আনন্দময় পুরুষ। তাঁর উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যচর্চা উৎসাহিত হয়, জীবন আরও প্রাণবন্ত হয়। পরে অর্থনীতি পড়াতেন নৃপেন ভট্টাচার্য। কিছুদিন তিনি বিশ্বভারতী নিউজের সম্পাদকও ছিলেন। বাংলায় অর্থনীতি নিয়ে তাঁর বই আছে। ভাল বাংলা লেখেন।

প্রত্যেক ভবনের আলাদা আলাদা সম্মিলনী ছিল। পাঠভবনে ছিল আদ্য মধ্য ও শিশুবিভাগের আলাদা সাহিত্য-সভা। আমরা বড়রাও যেতাম সভায়। ছোটরা নিজেদের লেখা পড়ত এবং সাধারণের বক্তব্য পর্যায়ে নিজেরাই অন্যদের লেখার সমালোচনা করত। এমনও দেখা গেছে, একটি জাপানী মেয়ের বাংলায় লেখা কবিতার বাংলায় সমালোচনা করছে একটি তিব্বতী ছেলে।

তাছাড়া আগেই বলেছি বড়দের জন্যে সব ভবন মিলিয়ে ছিল সাহিত্যিকা। যখন প্রথম ছাত্র হলাম, তখন সাহিত্যিকার সম্পাদক নবকান্ত বরুয়া ও বীণা গোস্বামী। আমি ও উমা রায় হয়েছিলাম পরে। চীন ভবনের পিছনে কান্তিচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্যিকার সভায় আমি প্রথম যে কবিতা পড়ি, তা যতই অপাঠ্য হোক না কেন, পড়ার সময়ে দুই হাঁটুতে কত্তাল বাজানোর স্মৃতি আজও ভুলিনি। আমাদের সময়ে অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন টিউনিয়ন ছিল না। শিক্ষাভবন সম্মিলনী বা কলেজ ইউনিয়নের কাজ ছিল সাংস্কৃতিক। তার বৈঠক বসত দ্বারিক বাড়ির দোতলায়। তখন সেক্রেটারি ছিলেন পঞ্চরত্ন প্রধান ও অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা।

আমাদের কয়েকজন লুকিয়ে লুকিয়ে দুটি হাতে লেখা দেয়াল কাগজ বের করত। স্টুডেন্টস ভয়েস এবং স্টুডেন্টস কাউন্টার ভয়েস। একটি অন্যটির পাল্টা। সবাই যাতে দেখতে পায়, সেই

জন্যে কিচেনের সামনে টাঙিয়ে রাখা হত। দেখাদেখি আমি ও সুলতান আলম একটা নতুন জিনিস লুকিয়ে চালু করি। শান্তিনিকেতনের নানা সরস ঘটনা নিয়ে সুলতান রঙিন কার্টুন আঁকত, তলায় আমি ছড়া লিখে দিতাম। জিনিসটা পরে অনেকের মর্ম বেদনার কারণ হওয়াতে কর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করে বন্ধ করে দেন। মাঝে মাঝে অবশ্য নিরর্থক কিছু ছড়া কেটে কৌতূহল বাড়িয়ে দিতাম। যেমন—ল্যাংমারা ঠ্যাং ভূশণ্ডির মাঠে দেখি, ল্যাকটোমিটার লটকায় লাটে এ কী। ভোঁচ কাটছে দাড়ি গোঁফ কালো চুল, ব্যাঙাচি লাফায় কাঁদে ইডিয়ট ফুল। আসলে কিছুই না। তবু এ বলে আমায় অপমান করেছে ও বলে আমায়—নানা গবেষণা। আমি আর সুলতান আড়ালে মুচকি হেসেছি। এই ছড়াকার্টুনের যুগলবন্দী বন্ধ হওয়ার কারণও আছে। আগেই বলেছি, মোফাজ্জল হায়দর বা হাইদারকে বলা হত মুখোজ্জ্বল উচুদর। সে তাঁর তিন সহপাঠিনী মহাশ্বেতা-সুদর্শনা-কল্যাণীর পিছন পিছন ঘুরত বলে "ত্রিমুণ্ডের পাটা, উঁচু দরের চাটা"—এই লিখে হায়দরের একটা কার্টুন টাঙিয়ে দেওয়া হয়। হায়দর নালিশ করে। নালিশে কাজ হয়।

তাছাড়া শিক্ষাভবন সম্মিলনীর বৈঠককে এসেম্বলি ধরে নিয়ে আমরা তার বিবরণ ছাপাতাম মর্নিং নিউজ নামক হাতে লেখা আর একখানা কাগজে। প্রধান উদ্যোক্তা প্রিয়ধর বরুয়া। প্রিয়দার মত এমন আমুদে ও জীবন্ত মানুষ খুব কম দেখেছি। কলেজ জীবনের নানা টুকিটাকি খবর এই কাগজে থাকত। হাতে লেখা সেই দু-পৃষ্ঠার কাগজখানা আমি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। খেলার মাঠে, ক্লাসের ফাঁকে কিংবা কিচেনের সামনে বান্ধবীদের না শোনাতে পারলে তো সব পরিশ্রম নিরর্থক। কে জানত, আমরা কয়েকজন সাংবাদিকতাকেই পরে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করব।

তবে বেশি চমক দিয়েছিল বৃহস্পতি। শুভময় ঘোষ, সুবীর সেন আর বিশ্বজিৎ রায় তার পাণ্ডা। নানারকম হাসির লেখায় ভরা,

তাতে কটাক্ষ চেনা অনেকের উপর। তার পাল্টা সুনীল সেনগুপ্ত বের করে প্রতিষেধক। কিন্তু দীর্ঘদিন টিঁকে থাকে বৃহস্পতি—অনেকটা সেকালের শনিবারের চিঠির মত। শুভময়দের সঙ্গে আগেই ভাব হয় সুলতান আলমের, ওর কাছেই ওরা আসত। আমি তখনও মুখচোরা গাঁইয়া। শুভময় আর বিশ্বজিৎ সেদিন এসেছে সুলতান আলমকে দিয়ে একটা কার্টুন আঁকাতে। আমাদের সহপাঠী সুনীল সেন (এখন বার্লিনে নাম করা ভাষাতাত্ত্বিক) সুনন্দা আর মুকুলকে এক ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিজে কোচোয়ান সেজে সারা আশ্রমে ঘুরে বেড়িয়েছে বিকেলবেলা। সেটাই কার্টুনের বিষয় হবে। সুলতান মুহূর্তে দুর্দান্ত একটা কার্টুন এঁকে দিল। শুভময় বলল—টেরিফিক। বৃহস্পতির প্রথম পাতায় যাবে। কিন্তু তার তলায় একটা ছড়া থাকলে জমত ভাল। কে লিখবে? আমার সঙ্গে তখনও বিশেষ আলাপ নেই। আমি ছিলাম পাশের বিছানায় শুয়ে। সুলতান বলল, "অমিতকে দিয়ে ট্রাই করানো যাক।" সবাই সেই প্রথম সীরিয়াসলি তাকালো আমার দিকে। তবু সন্দেহ, শুভময় বলল—"পারবে তো?"

পারব না মানে? পারতেই হবে। এই তো হল আমার পাসপোর্ট। সরস্বতী ভর করলেন, তকখুনি, কার্টুনের তলায় লিখে দিলাম—"সাবাস ভাই/এই তো চাই/কোচওয়ান কমরেডী ভাব/অনেক 'লাভ'/নও জোয়ান।" সুনীল আমাদের দলে একমাত্র কমিউনিস্ট ছিল। তাই তাকে ডাকা হত কমরেড। সেই আমার প্রথম ছড়া। মুহূর্তের মধ্যে লিখে দেওয়ার জন্যে শুভময়দের পছন্দ হয়ে গেল। আমাকেও ওদের ভাল লেগে গেল। শুভময় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল—চল্, আড্ডা মারতে যাই।

আমাদের কলেজ হস্টেলে ছিলেন তিন নিয়মত অতিথি। নবনীদাস বাউল। পূর্ণ দাসের বাবা। এক হাতে একতারা অন্য হাতে

ডব্‌কি, পায়ে ঘুঙুর, মাথায় পাগড়ি, গায়ে রঙিন জোব্বা এবং গলায় গান। নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে গাওয়া তাঁর গান—ভাল কইরা পড়গা গোরার ইস্কুলে—আজও ভুলিনি। পরে সঙ্গে নিয়ে আসতেন বালক বাউল ছেলে পূর্ণদাসকে। কী সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর। ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি। আসতেন নিশাপতি মাঝি। শ্রীনিকেতনে তৈরি মোড়া বিক্রি করতে। ১৯৪৬ সালে তিনি বীরভূম থেকে দাঁড়িয়ে এম এল এ হন। নিশাপতিদা টোকাও বিক্রি করতেন। তখন তালপাতার টোকা মাথায় পরা ছিল অভিজাত ব্যাপার। টোকার বড় সংগ্রহ ছিল শান্তিদার। আর ভুলু তো মাথায় টোকা না দিয়ে কদাচিৎ পথে বেরোত। রোদ আর জল আটকাতে শুধু নয়, ওটা ছিল শান্তিনিকেতনী পোশাকের অঙ্গ। তৃতীয় যিনি নিয়মিত আসতেন, তাঁকে আমরা ডাকতাম ভকতভাই। আসলে তাঁর নাম ছিল তারাপদবাবু। ভকতভাই নামে ডাকার কারণ, তিনি ছিলেন বোলপুরের বালেশ্বর ভকত মশাইয়ের কর্মী। বইপত্র কাগজকলম জামা-কাপড় যা দরকার হত আমরা তাঁর কাছে অর্ডার দিতাম, তিনি কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতেন। শ্রীশ দর্জির তনুশ্রী দোকান খোলার আগে তারাপদবাবুই আমাদের শার্ট পাঞ্জাবি বানিয়ে দিতেন।

গোটা শান্তিনিকেতন যেমন এক পরিবার, তেমনি আমাদের কলেজ হস্টেল ছিল বড় পরিবারের মধ্যে ছোট্ট আর একটি পরিবার। মাথার তেল নরেন্দু দত্ত কিনলে একদিনে শিশি শেষ করে রমাপদ কর মাখন কর। সুখময় ভট্টাচার্যের কেনা সাবান চল্লিশজনে শেষ করে একদিনে। অনিল সেনগুপ্ত কালী কিনল তো কলমে ভরল গুরুনাথ রাও। দুদিনেই দোয়াত শেষ। বুধবার বুধবার ছুটি। তাই মঙ্গলবার রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর হস্টেলেই হত টুইসডে পারফরমেন্স। প্রিয়ধর ও নবকান্ত বরুয়া নাচতেন, লোকনাথ ভট্টাচার্য স্বরচিত গান গাইতেন, অজিত বিশ্বাস গল্প পড়ত, ভবনাথ সরকার করত ক্যারিকেচার, বিমলেন্দু চৌধুরী গাইত ক্লাসিক্যাল গান, প্রিয়ধর বরুয়া

চায়ের কাপ দিয়ে জলতরঙ্গ বাজাতেন, অনিল ব্যানার্জি প্রমোদ বরুয়া সেতার বাজাতেন, অশোক মুখার্জি করতেন এককাভিনয়, হীরেন ভট্টাচার্য করত নকল, পঞ্চরত্ন এমন নাচতেন নেপালী গান গেয়ে গেয়ে, তপেন নিয়োগীও সেতার হাতে বসে যেতেন, আমি তবলার সঙ্গে ছড়া বলতাম, সনৎ ব্যানার্জি গাইতেন নানা ভাষার একলাইন দিয়ে মজার এক আন্তর্জাতিক গান।

র‍্যাগিং বলতে যা বোঝায়, তা কোন দিন হস্টেলে ছিল না। বড় জোর ভূতের ভয় দেখানো কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় খাটসুদ্ধ মাঠে রেখে আসা—ব্যস ওইটুকুই। হস্টেলের চারপাশে ধোপাদের গাধা ঘুরে বেড়াত। এই গাধাকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করতাম। রাত্রে অন্ধকার ঘরে কারও তক্তপোষের পায়ায় গাধা বেঁধে বাইরে থেকে ঢিল মারতাম। গাধা প্রাণভয়ে চিৎকার পাড়ত, সেই চিৎকারে তক্তপোষের মালিক হাউ মাউ করে বেরিয়ে আসত। একবার গাধার অভাবে একটা কুকুর ঘুমন্ত আশরাফ সিদ্দিকির লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল হীরেন ভট্টাচার্য। পাশবালিশ ভেবে জড়িয়ে ধরতেই কুকুর কামড়ে দেয় আশরাফের পা। তারপর ভীষণ ব্যাপার। আশরাফ ভেবে বসল, তার হাইড্রোফোবিয়া হয়ে গেছে। ভয়ে স্নান করে না, জল খায় না, আর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দিকে কটমট করে তাকায়। পরে ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বলেন, কিছুই হয়নি। আশরাফ অনিলদার কাছে নালিশ করেছিল। নালিশের ব্যাপার অনিলদা ঠেলে দিতেন ভাইস প্রিন্সিপাল বিনয়গোপাল রায়ের কাছে। বিনয়দা অনেক ভেবেচিন্তে গম্ভীর মুখ করে বললেন, ভাগ্যিস গাধা তোমাকে কামড়ায়নি।

ফার্স্ট ইয়ারে পূজার ছুটির পর হস্টেলে ফিরে আমি ভীষণ বোকা বনেছিলাম। রবীন্দ্র সিং ভাণ্ডারী ও গৌরীশঙ্কর রায় ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। আমাকে একদিন আলাদা ডেকে এনে অভিভাবকের ভঙ্গীতে বললেন, "ছুটির সময় ক্লাসের কোন মেয়েকে চিঠি লিখেছ?"

হ্যাঁ লিখেছি।

কেন লিখেছ?

ওদের ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিলাম যে।

ওদের কেউ জবাব দিয়েছে?

দিয়েছে।

ঠিক আছে। সব জবাবগুলো নিয়ে এস।

কেন?

অপরাধ করে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? অনিলদাকে সব দেখাতে হবে।

আমি ভয়ে সব জবাবগুলো ওদের হাতে তুলে দিলাম এবং বললাম, 'অনিলদাকে কিন্তু বলবেন না।' ওঁরা অভয় দিলেন। এদিকে আমি তো ভয়ে মরি, এখানকার নিয়মকানুন ভাল জানি না। হয়তো মেয়েদের কাছে চিঠি লেখা অপরাধ। যাই হোক, ওরা চিঠিগুলো দিন দুই পর ফেরৎ দিয়ে দিলেন এবং আমি যখন অনিলদার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব কি না ভাবছি তখন রবিদা এসে বললেন, "আরে বোকা, তোমাকে নিয়ে আমরা মজা করছিলাম।" তখন বোকামির জন্যে নিজেই নিজের চুল ছিঁড়লাম।

পেছনে লাগার ঘটনা অজস্র। আমরা বলতাম 'ডাউন ডাউন।' বিশ্বজিতে আমাতে এই ডাউন ডাউন খেলা অনবরত চলত। তার কিছু দৃষ্টান্ত দিই। প্রতি বছর পূজার ছুটির আগে দরিদ্র ভাণ্ডারের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা খাবার-দাবারের স্টল দিয়ে করে একদিনের আনন্দবাজার। সেই আনন্দবাজারে শিক্ষাভবনের স্টলের জন্যে বিশ্বজিৎ পুরানো গেস্ট হাউসের বংশীর কাছ থেকে বারোটা কাপ প্লেট নিয়ে এসেছিল। নানা ঝামেলায় মাস দুই ফেরত দেওয়া হয়নি। হঠাৎ একদিন বলল, "চল ওগুলো ফেরত দিয়ে আসি।" আমি ভুলু আর বিশ্বজিৎ বিকেলের দিকে বংশীর কাছে যাই। বিশ্বজিৎ যে-ই গুণে গুণে কাপপ্লেটগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মাথায় হঠাৎ বদখেয়াল

হল। বংশী শুনতে পায় এমনভাবে ফিসফিস করে বিশ্বজিতের কানের কাছে বললাম, "বিশ্বজিৎ, যে কাপটা ভেঙেছিল, সেটা কী করলি।" বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। আমি ভালমানুষ সেজে আবার বলি, "ওই যে সেদিন তোর হাত থেকে পড়ে গেল।" বিশ্বজিৎ এবার বুঝতে পেরেছে নষ্টামি। চোখ পাকিয়ে বলে, "বাজে কথা বলিস কেন, কাপটাপ মোটেই ভাঙেনি।" বংশী তখন পেয়ে বসেছে,—"না দাদাবাবু, আপনি তেরটা কাপপ্লেট নিয়েছিলেন, বাকি একটা ফেরত দিন।" মাস দুই আগেকার কথা, স্পষ্ট করে কারও মনে নেই। বিশ্বজিৎ যত বোঝায় বারোটাই নিয়েছে, বংশী ততই নাছোড়বান্দা, তেরটা সে ফেরত নেবেই। বেগতিক দেখে ভুলু পালিয়েছে পেটে হাত দিয়ে হাসির দমক চেপে। আমি দাঁড়িয়ে আছি আর বিশ্বজিৎ অসহায়ভাবে বংশীকে বোঝাচ্ছে। বংশী ছাড়ে না। আমি তখন আবার ন্যাকা সেজে বললাম, "কী যে করিস ভাই বিশ্বজিৎ, গরিব মানুষের ক্ষতি করে কী লাভ। দিয়ে দে না কাপ-প্লেটের দামটা।" নাছোড়বান্দা বংশী আমার কথায় সায় দিল এবং বিশ্বজিৎকে সত্যি সত্যি দাম দিয়ে রেহাই পেতে হল।

বংশীর কাছ থেকে চলে এসে বিশ্বজিৎ রেগেমেগে বলে, "দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি মজা। এর শোধ তুলব।" ভুলু বলল, "বেশ হয়েছে, আর লাগিস না অমিতের পিছনে।"

বিশ্বজিৎ কিন্তু সত্যি সত্যি শোধ তুলল অনেক দিন পর। বিশ্বজিতের পিসতুতো দাদা ননীদার লিলুয়ার বাড়িতে গিয়েছি। আমি ভুলু বিশ্বজিৎ পূর্ণানন্দ ও সুপ্রিয়া। খাবার ঘরে বসে সকালের চা জলখাবার খাচ্ছি। ননীদার স্ত্রী মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে খাবার ঘরে আসছেন। বৌদি যখন রান্নাঘরে, বিশ্বজিৎ টেবিলের বিরাট একখানা রেকাবিতে রাখা দানাদার মিষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, "অমিত, এই ভাল মিষ্টিগুলোর কিছু পকেটে পুরে নে, পরে খাওয়া যাবে।" আমার কী যে দুর্মতি হল, বিশ্বজিতের কথায় ভুলে পকেটে

গোটা সাত ওই শুকনো মিষ্টি পুরলাম। বৌদি খানিক বাদে খাবার ঘরে আসতেই বিশ্বজিৎ বোমা ফাটাল। ভারী গলায় বলল—বৌদি, অমিত মিষ্টি চুরি করেছে।

বৌদি রসিকতা ভেবে কাপে চায়ের লিকার ঢালতে ঢালতে বললেন, তা বৌদির বাড়ি থেকে দেওররা কিছু না কিছু চুরি তো করবেই। সবাই স্থির হয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে, আর আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। বিশ্বজিৎ অম্লান বদনে আবার বলল, সত্যিই চুরি করেছে বৌদি। আমি মানা করলাম, তবু পকেটে পুরেছে। আমি দেখলাম মান ইজ্জত যায়। এই বাড়িতে প্রথম এসেই কেলেঙ্কারি। মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে শুকনো গলায় তবু বললাম—বিশ্বজিতের যত কাণ্ড, সব ব্যাপারে ফাজলামি। বৌদির বাড়ির মিষ্টি বসেই খাব তো সামনে বসেই খাব, পকেটে পোরার কী আছে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই বজ্রাঘাত। বিশ্বজিৎ জবরদস্তি আমার পকেটে হাত পুরে একটার পর একটা মিষ্টি বের করে টেবিলে রাখল এবং বলল—দেখুন বৌদি, দেখুন। বেচারা বৌদি হতভম্ব, অন্যরা চুপ, বিশ্বজিতের মুখে বিজয়ীর হাসি—তার মধ্যে জিঘাংসা মেশানো। আর আমি? আমিতে নেই। মাথাটা বোঁ বোঁ করছে, মুখ দিয়ে কী একটা শব্দ বেরোল, যার কোন মানে হয় না। অপমানের এক শেষ। বৌদি ব্যাপারটা সামাল দিতে তবু বললেন, "আরে, তাতে কী হয়েছে, কিছু মিষ্টি সঙ্গে নিয়ে যাও না।"

আর মিষ্টি! উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সবাই যখন বাড়ি থেকে বেরোলাম, বিশ্বজিৎ বলল, কেমন হল তো? আর লাগবি আমার পিছনে? বললাম, এক মাঘে শীত পালায় না। দেখা যাবে।

সুযোগ মিলল কিছুকালের মধ্যেই। তাসের দেশ চিত্রাঙ্গদা নিয়ে বিশ্বভারতীর দল গেছে পাটনা। আমিও দলে আছি। পাটনা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস তখন সুধাংশুকুমার দাস। একদিন বিকেলে ওদের বাড়িতে সকলের চা-খাবার নেমন্তন্ন। ব্রাহ্মসূত্রে দাস-পরিবারের

সঙ্গে বিশ্বজিতের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা। বিশ্বজিৎ ওদের বাড়ি থেকে ক্রিকেটের উপর কয়েকখানা বই নিল, বলল, 'মাসিমা কলকাতা ফেরার আগে ফেরত দিয়ে যাব।' দিন কয় পাটনায় ছিলাম। বিশ্বজিৎ বই ফেরত দিতে ভুলে যায়। যেদিন পাটনা ছাড়ব, সেদিন বিকেলে চীফ জাস্টিসের বাড়ি থেকে সাইকেলে চড়ে এক আর্দালি এসে হাজির আমাদের আস্তানায়। বিশ্বজিৎ ভিতরে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারছিল। আর্দালিকে আমি দেখতে পাই। এগিয়ে যেতেই আর্দালি একখানা চিঠি দিল। মিসেস দাসের চিঠি। বিশ্বজিৎকে লেখা।—"স্নেহের বিশ্বজিৎ, বইগুলো ফেরত দিলে খুশি হব। ইতি মাসিমা।" আমার মাথায় তখন প্রতিশোধ ঘুরছে। আমি বিশ্বজিৎ সেজে চিঠির উত্তর লিখে দিলাম। মিসেস দাস বিশ্বজিতের হাতের লেখা চেনেন না, এই সত্য ধরে নিয়ে লিখলাম—"পূজনীয় মাসিমা, আপনার কাছ থেকে আনা বই তিনটি হারিয়ে ফেলেছি, তাই ফেরত দিতে পারলাম না। আপনি কিছু মনে করবেন না। তবে আমার শীঘ্রই একটি চাকরি পাবার কথা আছে। চাকরি পেলে বইগুলির দাম মনিঅর্ডারে পাঠিয়ে দেব। তখন আশাকরি আপনার কোন ক্ষোভ থাকবে না। ইতি আপনার স্নেহের বিশ্বজিৎ।"

বিশ্বজিৎ কিছুই জানল না। চিঠিটা নিয়ে আর্দালি চলে গেল। শান্তিনিকেতন ফেরার পর বিশ্বজিৎ তাঁর মাসিমা অর্থাৎ মিসেস দাসের একখানা কড়া চিঠি পেল, সঙ্গে আমার হাতে লেখা সেই চিঠি। বিশ্বজিৎ কটমট করে তাকাল আমার দিকে। মিসেস দাসের সঙ্গে ওর মিটমাট হয়েছিল কিনা সে খোঁজ অবশ্য নিইনি।

সেই আড্ডা আর ডাউন ডাউন খেলার জের এখনও চলছে। তবে শুভময় অর্থাৎ ভুলু, হঠাৎ চলে গেল ১৯৬৩ সালে। অকালে। হাবলু গেল ভুলুর কাছে ১৯৭৩ সালে। তারপর অনীশ। ১৯৭৮ সালে।

তবে ওরা চোখের আড়াল হলেও সব সময় কাছে আছে। ভুলু ছ'বছর মস্কোতে কাটিয়ে দেশে ফেরে। ফিরেই প্রাণঘাতী অসুখে

পড়ল। ভর্তি করানো হল পি জি হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো গেল না। ১৫ই সেপ্টেম্বর সে বিদায় নিল। সে বহুদিন আগে সুপ্রিয়াকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিল, তাঁর মৃত্যু যেন শরৎকালে হয়। তাই হয়েছে। সে চেয়েছিল, মৃত্যুর সময় সে যেন 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে' গানটি গাইতে গাইতে মৃত্যুর কোলে চলে যায়। তাই হয়েছে। কিন্তু সে অচেতন ছিল বলে নিজে গাইতে পারেনি। এক অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ঠিক তার মৃত্যুর ক্ষণেই রেডিওতে বেজে ওঠে ওই গানটি এবং সেই গানে ভেসে যায় পি-জির ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ড—যেখানে সে ছিল শয়ান। আমরা, তাঁর আত্মীয় আর বন্ধুরা, সেই শেষ শয্যার কেবিন থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো। সব দেখছি, সব শুনছি। কিন্তু তাঁকে আর ফিরিয়ে নেওয়া গেল না, দু'হাত দিয়ে বিশ্বকে ছুঁতে সে মহাবিশ্বে মিলিয়ে গেল। হাবলু ও অনীশের মৃত্যুও বড় করুণ। বড় অভাবিত। দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুজনে হঠাৎ চলে যায়।

তবু আড্ডা চলছে। হালের আড্ডায় যোগ দেয় আমাদের মেয়ে বন্ধুরাও। এই তো সেদিন সহপাঠী নরসিংভাই প্যাটেল বত্রিশ বছর পর আমেরিকা থেকে এল কলকাতায়। এল শান্তিনিকেতনের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। রাণাদার বাড়িতে রাতভর আনন্দ নাচ গান ঠাট্টা তামাসা। সেই সঙ্গে পুরোনো কথা তুলে হা-হা হাসি। সেই হাসিতে আমাদের স্ত্রীরাও যোগ দেয়। যোগ দেয় আমাদের বান্ধবীর স্বামীরা। আমাদের ছেলেমেয়েরা ছেলেমানুষ হয়ে যাওয়া আমাদের দিকে যখন অবাক হয়ে তাকায়, আমরা তখন ওদের বলি, ওরে, আমরাও খেলা খেলেছিলেম, আমরাও গান গেয়েছি।



রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি তাঁর আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃতির রঙমহলে পৌঁছে দিয়েছেন গানে। সত্যিই তাই, গীতবিতানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এই শান্তিনিকেতন। প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলো ছড়িয়ে আছে পলাশের ডালে, শিউলি তলায়, বকুলের গন্ধে, ঘাসের শিশিরে। ঋতুর সোহাগে সব জীবন্ত। কখন বর্ষা আসে, কখন বসন্ত যায় আমরা টের পেতাম গানে। তখন শান্তিনিকেতনের পথে-ঘাটে আড়ালে-আবডালে কেবল গান আর গান। দেহলির পাশে বনপুলকের গন্ধে উদাস কেউ যদি ধরল 'গন্ধে উদাস হাওয়ার মত উড়ে তোমার উত্তরী', তক্ষুনি মাধবীবিতানের কাছ থেকে আর একজন গেয়ে উঠল—'কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।' জ্যোৎস্নায় ভরে আছে শালবীথি। শালের মঞ্জরীতে পথ ঢাকা। হয়ত কোন মেয়ে আপনমনে গান গেয়ে চলেছে—'নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা'। গান গাইতে গাইতে মেয়েটি চলে গেল শ্রীভবনের দিকে। গানের রেশ তখনও শালবীথি আম্রকুঞ্জ মাধবীবিতানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং ঠিক তখনই মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কলেজ হস্টেলের হয়ত একজন গুনগুন গান ধরল, 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়'। কিংবা পুরানো ঘণ্টাতলায় ভরদুপুরে একা বসে একজন হয়ত আপন মনে গেয়েই চলেছে—'এই তো ভাল লেগেছিল'। তার ভাল লাগা অন্যদেরও ভাল লাগায়।

সংগীতভবনে শৈলজাদার রিহার্সাল ক্লাস থেকে ছড়িয়ে পড়ত আজি বরিষণ মুখরিত, কিংবা, কখন বাদলছোঁয়া লেগে। পূজার ছুটির আগে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে শরত যখন আসত, পাঠভবনের ছেলেরা বেরিয়ে পড়ত গান গাইতে গাইতে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম—নীল আকাশে কে ভাসালে শাদা মেঘের ভেলা। শারদোৎসবের পর

বসন্তোৎসব—আবার শৈলজাদার রিহার্সাল রুম থেকে উজাড় করা গান। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল। বসন্ত রাতে যখন বৈতালিক বেরোত, স্তব্ধ আম্রকুঞ্জ মন দিয়ে শুনত—আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুন। আবার পঁচিশে জুলাই—গুরুদেবের শেষবারের মত শান্তিনিকেতন ছাড়ার রাতে, বৈতালিক দল আশ্রম পরিক্রমা সেরে থামত এসে উদয়নের সামনে। যেন আশ্রমগুরু আছেন, এখনই ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াবেন, গানে গলা মেলাবেন। বৈতালিক দলের পিছনে চলা আমিও মনে মনে গেয়ে উঠতাম—ভালবেসেছিনু এই ধরণীরে, সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে, কত বসন্তে দখিনা সমীরে ভরেছে আমার সাজি, কী পাইনি—। একটু বিষাদ, একটু বিহ্বলতা বাকি রাত সারা আশ্রমকে আকুল করে রাখত।

আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে, গায়ে ধুতি পাঞ্জাবি চাদর, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি ছোটখাট শৈলজাদা হাতে মন্দিরা নিয়ে ভোর রাত্রের বৈতালিক দলকে লীড করছেন, পেছনে বড় এসরাজ হাতে মসোজি, বেহালা হাতে চৈতীদা ও সিংহলী ছাত্র সমরদিবাকর এবং বিরাট গানের দল। বাঁশিতে মিঠে সুর বাজাচ্ছে বিভাসদা বা বরেন। আর আমরা চলেছি পিছন পিছন। খানিক চলার পর মনে হত, আমরা এ জগতের কেউ নই, আমরা সবাই অশরীরী। সেই আদি-কাল থেকে অনবরত হেঁটে চলেছি অজানা ঠিকানার দিকে।

সেই সময় বর্ষার মাতন দেখতে হলে যেতে হত শান্তিনিকেতনে। বসন্তের আগুন দেখতে হলে যেতে হত শান্তিনিকেতন। সুনীল শরৎ, কুহেলিবিলীন হেমন্ত, পাতাঝরা শীত এবং দারুণ অগ্নিবাণের প্রখর গ্রীষ্মকে বুঝতে হলেও যেতে হত শান্তিনিকেতন। গানের সুরে আর প্রকৃতির রঙে মিশে যেত সব কিছু। বিশ্বজিৎ আর শুভময় সেই ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে এত গান উপহার দিয়েছে অষ্টপ্রহর, যার কোন তুলনা নেই। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে সুধীর চন্দ প্রবীর গুহঠাকুরতা

সুকীর্তি কর অমিত মিত্র অনীশ ঘটক সুনন্দা রায় সুদর্শনা রায়—সব আটপৌরে গাইয়েরা। প্রবীর গুহঠাকুরতার ডাক নাম বাদল—বর্তমানে বনবিভাগের বড়কর্তা কিন্তু যদি গান গাওয়াটাকে পেশা হিসেবে নিত, তাহলে কোন পুরুষ গাইয়ে তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হতে পারত না। প্রবীর খেলাধূলায়ও ছিল সেরা। আর অনীশ,—গানের গলা অসাধারণ নয়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। ছিল একজন প্রাণবন্ত পুরুষ। এখনও মনে পড়ে, রাত বারোটা অবধি আড্ডা মারার পর বিশ্বজিৎ পূর্বপল্লীর মাঠ ডিঙিয়ে বাড়িতে একা ফিরছে আর আমরা হস্টেল থেকে শুনছি তার ভরাট গলা থেকে ভেসে আসা গান—চৈত্র রজনী বসে আছি আজ একা। কিংবা মনে পড়ছে, শুভময় ঝিরঝির বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে খেলার মাঠ পেরোচ্ছে আর আপনমনে গেয়ে চলেছে—মেঘছায়ে সজল বায়ে উতলা করে সারা বেলা। স্কুলের ছোট্ট ছেলে অমিত মিত্র—ওরে আমার হৃদয় আমার—গাইতে গাইতে চলে যায় ছাতিমতলার দিকে। বাদল আর সুবীর দুই বন্ধু গল্প করছে সত্য কুটিরের সামনে। গল্প থামিয়ে বাদল গান ধরে দিল—কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া। সেই গানের গলা ছাপিয়ে বেণুকুঞ্জের বারান্দায় আরও জোরে অন্য একজন বাকিটুকু গেয়ে ওঠে—'এসেছি ভুলে।' সেই গানের রেশে উতলা হত কোআপের আড্ডা, কলেজের ক্লাস, অফিসের কাজ। চায়ের দোকানে বসে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে চলত গান এবং কোন এক জায়গায় বসতে পারলে তো কথাই নেই, পুরো বাল্মীকি প্রতিভা বা চণ্ডালিকা অভিনয় হয়ে যেত গানে গানে।

গানের কোন সময় অসময় ছিল না। ক্ষিতিমোহন সেন হয়ত মধ্যযুগের সন্তদের নিয়ে পুঁথি ওল্টাচ্ছেন, হয়ত প্রবোধচন্দ্র সেন লাইব্রেরিতে বসে রবীন্দ্রজীবন নিয়ে আলোচনা করছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিংবা নলিনীদি ক্লাস নিচ্ছেন বাংলার, ঠিক এমন সময় পাঠভবন থেকে এক ঝাঁক গান এসে তাঁদের উন্মনা করে দিত।

পাঠভবনের চিত্রলেখা চৌধুরী, মিত্রা দত্ত, অন্তু দত্ত, অন্তু ঘোষ, নন্দিতা চক্রবর্তী, মানসী বসু, পূর্ণেন্দু সিংহ—কী সুন্দরই না গাইত। এই গান জমিয়ে রাখত পিকনিক, আউটিং, এক্সকার্সন। মনে পড়ছে, ১৯৪৬ সালের এক্সকার্সনে ডিসেম্বরের শেষ রাত্রে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনে নামার পর সহপাঠিনী সুনন্দা রায় ও আনতা সেনের নেতৃত্বে দলের সবাই 'ভুবনেশ্বর হে' গানটি গাইতে গাইতে মাইল তিন দূরে আমাদের ডেরায় গিয়েছিলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সেই সঙ্গে ঘন অন্ধকার। তার মধ্যে চলছিল "তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।" আমরা হাঁটছি আর গান চলছে। যারা গাইছে তারা যেন স্বপ্নাবিষ্ট। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

এই গান আর প্রকৃতি মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের বেশির ভাগ উৎসব। বৃক্ষরোপণ হলকর্ষণ বর্ষামঙ্গল শারদোৎসব বসন্তোৎসব। আমার প্রথম স্মৃতি বৃক্ষরোপণের। বাইশে শ্রাবণ সকালে মন্দির। গুরুদেবের মৃত্যুবার্ষিক। ক্ষিতিমোহনবাবুর অনবদ্য উপাসনা আর তার সঙ্গে বাচ্চু অর্থাৎ নীলিমা গুপ্তের (পরে সেন) অত্যাশ্চর্য গান—আছে দুঃখ আছে মৃত্যু। পরে বহুবার এই গান অন্যের মুখে শুনেছি, কিন্তু প্রথম স্মৃতি ভুলিনি। গানটি যেন বাচ্চুর গাওয়ার জন্যই লেখা। তারপর বিকেলে কলেজ হস্টেলের ভিতরেই বৃক্ষরোপণ। শিশু বৃক্ষকে চতুর্দোলায় নিয়ে আসা, মকাবজয়ের কেতন উড়াও গানের সঙ্গে নৃত্যশোভাযাত্রা, পঞ্চভূতের পাঠ এবং "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল" গান মনে ছবি হয়ে আঁকা রয়েছে। পরদিন সকালে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ। এলমহার্স্ট সাহেব এসেছিলেন। 'ফিরে চল মাটির টানে' গান গাইতে গাইতে এসে সুসজ্জিত ষাঁড়কে দিয়ে লাঙল টানানো আমার মত গ্রামের ছেলের কাছেও নতুন অভিজ্ঞতা। হলকর্ষণের কিছুদিন পর বর্ষামঙ্গল। হওয়া উচিত ছিল প্রথমে বর্ষামঙ্গল, তারপর হলকর্ষণ, তারপর বৃক্ষরোপণ। জল পড়বে, হল চলবে, তখনই তো গাছ পোঁতার কাজ।

শান্তিনিকেতনে তার উল্টো। আগে গাছ পুঁতে লাঙল চালাবে এবং তারও পরে বৃষ্টিতে মাটি ভিজবে।

সবচেয়ে উজ্জ্বল অনুষ্ঠান বসন্তোৎসব। আম্রকুঞ্জে ফাগের খেলার সঙ্গে গান কে ভুলতে পারে! মেয়েরা পরত হলুদ শাড়ি, ছেলেদের ধুতি পাঞ্জাবিও তাই। শালবীথি দিয়ে চলত নাচের মিছিল 'খোল দ্বার খোল।' অশোকে পলাশে তখন সত্যি সত্যি রাশি রাশি রাঙা হাসি এবং সেই সময়টা হঠাৎ পিছন ফিরে চলে যেত কালিদাসের কালে। এই 'খোল দ্বার খোল' নাচ সম্পর্কে মন্টু ঘোষদার একটা মজার গল্প আছে। মণিপুরী ভঙ্গীর নাচে আছে দুই পা এগিয়ে তিন পা পিছোনো। কলাভবন থেকে আম্রকুঞ্জে যাওয়ার কথা মিছিলের। কিন্তু দেখা গেল মেয়েরা পূব দিকে না এগিয়ে পশ্চিমে শ্রীনিকেতনের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে। মহা মুশকিল! কী করা যায় ভাবতে ভাবতে নাচের দল পিয়ার্সন পল্লীতে। তখন আশ্রমের বড় বড় কর্তারা এক সঙ্গে বসে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, নাচের দলের মুখ উল্টো করে দেওয়া হোক। করে দেওয়া হল এবং খোল দ্বার খোল গাইতে গাইতে আম্রকুঞ্জে পৌঁছল।

বসন্তোৎসব অনুষ্ঠানের পর আমরা 'যা ছিল কালো ধলো' কিংবা 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গানের সঙ্গে নাচতাম। মাথায় ও কোমরে রঙিন কাপড় বেঁধে আসর বসত পুরোনো ঘণ্টাতলার পাশে। ভুলু ছিল এই ব্যাপারে পাণ্ডা। শুধু পুরানো ঘণ্টাতলায় নয়, আশ্রমের নানা জায়গায় এমনি বসত নাচ গানের আসর। অনেক বেলা অবধি। এবং গানে গানে সত্যিই নিখিল উদাস। বসন্তোৎসবের রাত্রে খোলা আকাশের তলায় অতন্দ্র চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে হত কোন নৃত্যনাট্য বা গীতিমুখর নাটক। একবার ফাল্গুনী হয় শালবীথিতে।

পুজোর আগে বর্ষামঙ্গলের পর চলে একটানা অনেকগুলো অনুষ্ঠান। বেশিরভাগই নাটক—নানা ভবনের। সব সময়ই যে

রবীন্দ্র নাটক বা বাংলা নাটক অভিনীত হবে এমন কোন কথা নয়। মোহনলাল বাজপেয়ী যেমন শতরঞ্জ কি খিলাড়ি অভিনয় করিয়েছিলেন ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তেমনি করিয়েছিলেন শকুন্তলা। গৌরী আইয়ুব দত্ত সেজেছিল শকুন্তলা এবং বর্তমানে নাম করা ঐতিহাসিক ডঃ গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য দুষ্মন্ত। সুকুমার রায়ের হ-য-ব র-ল, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, বনফুলের কবয়ঃ, অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণ, হংসনামা, এসপার ওসপার, পরশুরামের বিরিঞ্চি-বাবা, চিকিৎসা সংকট, ভুশণ্ডির মাঠে. এমন কি আমার মত ক্ষুদ্রজনের লেখা তেপান্তরের মাঠে নাটকও অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ওই তিনটি যাত্রাপালা আমরা করেছি পৌষ উৎসবের সময় যাত্রার আসরে। ওগুলো এতই জনপ্রিয় হয় যে, শান্তিনিকেতনের লোকদের মুখে মুখে এখনও ঘোরে ওই যাত্রাপালার গান। পরশুরামের ভুশণ্ডির মাঠে গল্পটিরও আমি গীতিরূপ দিই ছাত্রাবস্থায়। শুভময়ের অনুরোধে বিশ্বজিৎ ও প্রবীরকে তাক লাগানোর জন্যে লিখেছিলাম এক রাত্তিরে। প্রধান সুরদাতা অরবিন্দ বিশ্বাস ও লোকনাথ ভট্টাচার্য। অরবিন্দ বিশ্বাস যখন তখন তুরন্ত সুর দিতে ওস্তাদ। পুজোর আগে আনন্দবাজারে কলাভবনের ছাত্ররা যখন সত্য কুটিরে জগদীশ মিত্তালের প্রযোজনায় করছে ছেলেমেয়েদের পুতুল সাজিয়ে সংযুক্তার স্বয়ম্বর, তখন সিংহ সদনে আমরা করি ভুশণ্ডির মাঠে। ভূমিকা লিপি তুলে দিলাম। তুড়ি বিশ্বজিৎ রায়, জুড়ি—লোকনাথ ভট্টাচার্য, ব্রহ্মদৈত্য —শুভময় ঘোষ, কারিয়া পিরেত—অমিতাভ চৌধুরী, যক্ষ—অরুণ বাগচি, পেত্নি—প্রবীর গুহঠাকুরতা, শাকচুন্নি—হীরেন ভট্টাচার্য (পরে প্রণব গুহঠাকুরতা), ডাইনি—শ্যামল মুখোপাধ্যায় (একবার সুদেব গুহ)। নাটকটি এমন জমে যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পরদিন আবার অভিনয় করতে হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী নববর্ষের সন্ধ্যায় রথীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসুকে নিমন্ত্রণ করে এনে সরকারী অভিনয় করান। পরে কলকাতায় শ্রীরঙ্গমে, নিউ এম্পায়ারে,

কলামন্দিরে, মুক্ত অঙ্গনে এবং শান্তিনিকেতনে বহুবার অভিনয় হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

এই ভুশণ্ডির মাঠে নাটক প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রামকিঙ্কর বেইজ— অর্থাৎ কিঙ্করদার কথা। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা ও দেহসজ্জার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। স্টেজ সাজানোর আগে একটার পর একটা স্কেচ করে যেতেন তার দু' একটি আমার কাছে আছে। আমরা তাঁর ছাত্র নই, কিন্তু তিনি ছিলেন নাটক-পাগল। তাঁকে দেখেছি বীরভূমের প্রখর মধ্যাহ্নে খাকি হাফপ্যাণ্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরে বিশাল বিশাল মূর্তি বানাতে, দেখেছি মোটা ব্রাশ হাতে ছবির আদলে চোখের পলকে রঙের তুফান জাগাতে, দেখেছি মালকোচামারা ধুতি পাঞ্জাবি ও মাথায় তালপাতার টোকা পরে খোয়াইয়ের দিকে একা চলে যেতে, দেখেছি জ্যোৎস্না রাতে মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান গাইতে কিংবা হা-হা অট্টহাসির প্লাবন জাগাতে এবং দেখেছি নাটকের রিহার্সেলে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী দিয়ে আমাদের অভিনয় শেখাতে। উনি কলাভবনের ছাত্রদের দিয়ে ১৯৪৫ সালে হ-য-ব-র-ল করালেন। দুর্দান্ত ব্যাপার। তারপর ১৯৪৯ সালে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে আমাদের দিয়ে আবার করালেন। আমি সেজেছিলাম কাক। হিজবিজবিজ তপেন নিয়োগী, নেড়া নবকান্ত বরুয়া, ব্যাকরণ সিং সনৎ ব্যানার্জি, বেড়াল মানিক ঘোষ ও আমি শুভময় ঘোষ উদো বুধো সুবীর সেন ও সুবীর দাশগুপ্ত কী পরিশ্রম করতেন মহড়ার সময়। মহড়া হত কালিদাস নাগ-শান্তাদেবীর বাড়িতে। তাঁদের তিন কন্যা মঞ্জুশ্রী শ্যামশ্রী ও পারমিতা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। আবার দেখেছি, ১৯৫৭ সালে একটি গ্রীক নাটকের রিহার্সেলের সময় সঙ্গীতভবন মঞ্চে ইংরেজির অধ্যাপক সুধীন ঘোষ মশাই যখন তাঁর প্রতি অসংযত আচরণ করলেন, তখন অসীম সংযম দেখিয়ে কিঙ্করদা শান্ত মনে মঞ্চ ছেড়ে চলে যান।

শান্তিনিকেতনে মায়ার খেলা, শাপমোচন আমি দেখিনি। শ্যামা,

চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ, বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া বারবার অভিনীত হয়েছে। আর বেশি হয়েছে অরূপরতন বা রাজা, প্রায়শ্চিত্ত বা পরিত্রাণ, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, শারদোৎসব, ডাকঘর, শেষরক্ষা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি। তাসের দেশে রাজপুত্র এবং বাল্মীকি প্রতিভায় বাল্মীকি বরাবর শান্তিদা। এমনটি আর কেউ পারে না। ১৯৮০ সালে সত্তর বছর বয়সে রাজপুত্র সেজে আবার আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। নাচ গান অভিনয়—তিনটিতে তিনি অদ্বিতীয়। আর শ্যামা কিংবা সুরূপা চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় সেবা মাইতি ছিলেন অপরূপা। মোহরদির গানের সঙ্গে সেবাদির নাচ যে দেখেনি সে বুঝতে পারবে না কত অসাধারণ এই ব্যাপারটা। তার উপর আবার সঙ্গে অশেষদার এসরাজ। উপরন্তু নন্দলালের পরিকল্পিত মঞ্চ ও পোশাক। শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম রক্তকরবী অভিনয় হয় আমাদের সময়ে। করিয়েছিলেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ। মঞ্চসজ্জা ও দেহ-সজ্জার ভার নিয়েছিলেন নন্দলাল স্বয়ং। নন্দিনী সেজেছিলেন টুলটুলদি—অর্থাৎ জয়শ্রী চন্দ। এই কান্তিদাই করান ইংরেজি 'দালিয়া'। ভাল অভিনয় করেছিল গীতা পোচা এবং অশোক চন্দের মেয়ে অঞ্জলি। আর একবার করান ইংরেজি 'চিত্রা'। বাঁশরি নাটক সর্বপ্রথম করান খগেন ভট্টাচার্য। বাঁশরি হন সুজাতা মিত্র। বহুদিন পর আবার করান সংস্কৃতের অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন বাঁশরি হয় সুনন্দা গুহ।

নাচ গানের দল নিয়ে তখন কলকাতা বম্বে দিল্লি পাটনা যাওয়া হত প্রতি বছর। এই সব ব্যাপারে শান্তিদার কথা ভাল করে না বললে সব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই, সেই সময়টা শান্তিদা কলকাতাতেই বেশির ভাগ থাকতেন। মাঝে মাঝে দেখতাম সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরে, ১৯৪৮ সালে, তিনি আবার শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। তাঁর গাওয়া কতকগুলো গান আমার কানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্র-

সঙ্গীতের অন্তঃকরণে পৌঁছে তাকে শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার জাদু তিনিই জানেন। গান্ধীজি যেবার এলেন, তাঁর সামনে বসে 'ওই আসন তলে মাটির পরে' গানটি কোনদিন আমি ভুলব না। জ্যোৎস্নার রাত। খেলার মাঠে বসে আছি। আছেন অনিলদা ও সুরেনদা। বিশ্বজিৎ ভুলু গান গাইছে। মনে হল সুরেনদার মন ভরছে না। কাকে যেন বললেন, শান্তিকে ডেকে আনতো। যেন তৈরি হয়েছিলেন, মুহূর্তে চলে এলেন শান্তিদা। তারপর গানের পর গান। যখন ধরলেন, মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে—কেউ তখন আর আত্মস্থ নেই। নাটক অভিনয়ের মহড়ায় এবং নৃত্যনাট্য তৈরীর সময় শান্তিদাকে দেখার মত। যেন নটরাজ মূর্তি ধরে এসেছেন। শান্তিদার বাল্মীকি আর রাজপুত্র তো এখন ইতিহাসের পাতায়। আমাদের সময়ে তাসের দেশে রাজা সাজতেন সন্তোষ ভঞ্জ চৌধুরী এবং রাণী ক্ষিতীশদার স্ত্রী উমা রায়। ছক্কা পাঞ্জা শিশির ঘোষদা ও মন্টু ঘোষদা। সওদাগরপুত্র শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে যতগুলো দল বাইরে গেছে, সুরেন করদা থাকতেন সর্বময় কর্তা হয়ে। শেষদিকে অবশ্য ম্যানেজার থাকতেন রণজিৎ রায়দা। বম্বেতে যেবার তাসের দেশ চিত্রাঙ্গদা গেল, আমি দলে না যেতে পারায় ভুলু-বিশ্বজিতের মন খারাপ। তাই পরের বছর যখন একই দলের পাটনায় যাওয়া স্থির হল, ভুলু-বিশ্বজিৎ ঠিক করল আমাকে দলে ঢোকাতেই হবে। 'যাবই আমি যাবই' গানের শেষভাগে দু-তিনজনের একটা দল-নৃত্য ছিল। মুখিয়াজি ও অমিত পাল নাচত। বিশ্বজিৎ শান্তিদাকে বলল, 'অমিতের দারুণ ছন্দ-জ্ঞান, নাচের আন্দাজ আছে। ওকে যদি মুখিয়াজিদের দলে একবার ট্রাই দেন।' শান্তিদা কড়া লোক, বললেন, 'দেখ বিশ্বজিৎ, ভুশণ্ডির মাঠে নাটকে কারিয়া পিরেতের নাচ আর গুরুদেবের নাটকের নাচ এক জিনিস নয়।' বিশ্বজিৎ তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললেন, 'আচ্ছা, নাচটা শিখে নিক, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখব।'

ভুলু একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। দুজনে যুদ্ধজয়ের গর্ব নিয়ে এল আমার কাছে। ভুলু বলল, "অমিত পালের কাছে 'হের সাগর উঠে তরঙ্গিয়া' নাচটা শিখে নে। পাঁচদিন পর দাদার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে।" আমার চেয়ে ওদের উৎসাহ বেশি। যখন বললাম, 'পারব না', তখন ভুলু রেগেমেগে বলল, "পারবি না মানে? পারতেই হবে। না পারলে দলের সঙ্গে যাবি কী করে?"

আমার অবস্থা কাহিল। পড়েছি যবনের হাতে। আর বেচারা অমিত পাল। দ্বারিকের দোতলায় রোজ বিকেলে আমাকে নাচ শেখাতে লাগল। ওই সময় অন্যরা আড্ডা মারে আর আমি করি ধিনতে ইততা, ঘিততে ধিন্ তা।

যাইহোক, পাঁচদিন পর শান্তিদার বাড়িতে দক্ষিণের বারান্দায় আমার নাচের পরীক্ষা। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভুলু ও বিশ্বজিৎ পরম উৎসাহে আমাকে এনে দাঁড় করাল। মন্টুদা, বড়বৌদি ও মাসিমা মোড়া নিয়ে বসলেন। শান্তিদা আসতেই আমার বুকে ধক ধক, পায়ে ঠকঠক। বিশ্বজিৎ ভুলু আমাকে ইসারা করেই গান ধরল। আমি ভূতাবিষ্টের মত নেচেও দিলাম। নাচের পর অস্বস্তিকর নীরবতা। পিনড্রপ সাইলেন্স। খানিকবাদে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল শান্তিদা? শান্তিদা গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার কী রকম মনে হয়? আমি বললাম, যাচ্ছেতাই। শান্তিদা হেসে ফেললেন, বললেন, ঠিকই বলেছ। ভাল নাচতে না পার, তুমি দেখছি নাচ ভাল বোঝ। আমার ফাঁড়া কাটল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এবং অবশেষে শান্তিদা কনসোলেশন প্রাইজ হিসাবে আমাকে দলের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করে নিয়ে নিলেন। ভুলু-বিশ্বজিৎ খুশি।

১৯৫৩ সালে দিল্লিতে ইন্টারন্যাশনাল লো-কস্ট হাউজিং একজিবিশনে শান্তিনিকেতনের দল গেল। সেবার আমার একটু প্রমোশন হয়েছিল। আমি হয়েছিলাম প্রম্পটার। নাচ জানি না, গান জানি না, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। পরের বছর

আবার প্রমোশন। পোস্টাল সেন্টিনারিতে দিল্লিতে যাবে ডাকঘর। আমি ছিলাম প্রম্পটার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় পিসেমশাইয়ের পার্ট দেওয়া হল অশোকবিজয় রাহাকে। অশোকদার পার্ট ছিল কবিরাজের। পার্ট বদলের সুযোগে আমি হয়ে গেলাম কবিরাজ।

পরে শান্তিদার পরিচালনায় শান্তিনিকেতনে ফাল্গুনীর নবযৌবনের দলে এবং অরূপরতনে জনতার দলে ঢুকতে পেরেছিলাম। মুক্তধারায়ও তাই। শেষরক্ষা আমি করাই। তাতে সেজেছিলাম শিবচরণ। শুভময় গদাই। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রদা। অভিনয়ে ওঁর আগ্রহ অত্যধিক। প্রসেনজিৎ সিংহ সেজেছিল বিনোদ এবং প্রণবরঞ্জন রায় ললিতা সনজিদা খাতুন হয়েছিল ক্ষ্যান্তমণি। শিখা গুহ ইন্দুমতী এবং কেকা চৌধুরী কমলমণি। আর লম্বকর্ণতে একবার হয়েছিলাম মানিনী, অন্যবার (কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে) চুকন্দর সিং। বিরিঞ্চিবাবায় মৌলভী।

আমার দেখা প্রথম নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিন হয়েছিল। রাজবাড়িতে বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং। এখনও বুকে সেই ঢং ঢং বাজে। তখন নববর্ষের দিন যে নাটক হত তাই যেত বাইরে—কলকাতা, দিল্লি, বম্বে'তে। আগের বছর বম্বে গিয়েছিল বাল্মীকি প্রতিভা। সেবার চণ্ডালিকায় প্রকৃতি সেজেছিলেন নন্দিতা কৃপালনি, মা অনুদি। চুড়িওলা অনাদিপ্রসাদ, দইওলা বিহারী সিং। আনন্দ সেজেছিল সিংহলী ছাত্র চিত্রসেনা অমরতুঙ্গ। সমবেত নৃত্যে ছিল মঞ্জুলা দত্ত পূরবী দত্ত বীথি ধর মঞ্জু রায়চৌধুরী ও বেলা মিত্র।

তখন অনেক সিংহলী ছাত্র কলাভবন ও সঙ্গীতভবনে। চিত্রলেখা ডি ফনসেকা, দয়ানন্দ ডি-মাল, প্রেমকুমার চিত্রসেনা সমর দিবাকর, এডওয়ার্ড গেরুগে, মাকালুলু জয়বর্ধন, পানিভরত বিমল নয়নানন্দ প্রভৃতি। শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা সিংহলীরা যখন তাদের ঘন-

কালো ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে দল বেঁধে কিচেনে খেতে আসত, মনে হত, সংগীতভবনের ওদিকটায় কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। পানিভরত ও বিমল শ্যামায় কোটালের ভূমিকায় পৌরুষের ক্যাণ্ডি নৃত্য ঢুকিয়ে নতুন চেহারা এনে দেয়। শ্যামার ভূমিকায় সেবামাইতির নাচের কথা বলেছি, বজ্রসেনের ভূমিকায় বালকৃষ্ণ যেমন ছিলেন অনবদ্য। সেবাদি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী, শরীরটা ছিল পালকের মত হালকা, যখন নাচতেন, মনে হত ভেসে বেড়াচ্ছেন। অকালে তিনি প্রাণ হারালেন। তাঁর বোন পুষ্প মাইতি ও সুজাতা ঘোষও (মিত্র) উঁচুদরের নাচিয়ে ছিলেন।

তাঁর ছোট বোন পুষ্প মাইতিও ভাল নাচতেন। নানা সময়ে আর ভাল নাচত মঞ্জুলা দত্ত, শিবানী গুহ, শিখা গুহ, মিত্রা দত্ত, আলো দত্ত, পূরবী দত্ত, প্রীতি ঘোষ, উমা গান্ধী, কিরণ মহাজন, গৌরী রায়, প্রণতি চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চট্টোপাধ্যায়, ইলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কেকা চৌধুরী, প্রভাতী দত্ত, দিয়ালি সেন। পূরবী মঞ্জুলা মঞ্জু ভাল গানও গাইত। তনয়দার কন্যা এবং নন্দলালের পুত্রবধূ নিবেদিতা—বেবীদি—আগে ভাল নাচতেন। আর ভাল নাচতেন সুশীলা আসার—গুজরাতের মেয়ে। সিংহলী ছেলেরা ছাড়া মুখিয়াজি এবং হরি উপ্পল ছিল ভালো পুরুষ নাচিয়ে।

অরূপরতন ও বিসর্জন নাটকও দেখেছিলাম ১৯৪৬ সালে। বিসর্জনে নীলিমা অপর্ণা, বিভূতি গুপ্তদা জয়সিংহ, রঘুপতি সরোজরঞ্জন চৌধুরী। রোমান্টিক জয়সিংহ চরিত্র কোন ছাত্রকে না দিয়ে একজন শিক্ষককে দেওয়া হয়েছিল কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে। অরূপরতনে সুদর্শনা সেজেছিলেন মীরা চট্টোপাধ্যায়, সুরঙ্গমা জয়া পালিত। পঞ্চাশের দশকে সুভাষ চৌধুরীর পরিচালনায় স্বর্গীয় প্রহসন ও খ্যাতির বিড়ম্বনার স্মৃতি আজও মনোহর।

ঋতু উৎসব ও নাটক বাদ দিলে আর একটি আনন্দের দিন ছিল গান্ধী পুণ্যাহ। প্রতি বছর ১০ মার্চ আশ্রমের ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকরা

মেথর, ঝাড়ুদার, মালী, ঠাকুর, চাকর, পিয়ন, বেয়ারাদের ছুটি দিয়ে ওদের সব কাজ করে থাকেন। বিরাট উৎসব যেন। নন্দলাল বসু বরাবর নিতেন পায়খানা সাফের কাজ। আমরা নিতাম বাসন মাজার কাজ। কাজের সঙ্গে চলত হৈ চৈ। গান্ধীজি ১৯১৫ সালে শান্তি-নিকেতনে এসে বলেন, ঠাকুর চাকর কেন, ছাত্ররা নিজেরা নিজের কাজ সারা বছর করুক। রবীন্দ্রনাথ রাজি। কিন্তু ঘটল অঘটন। ক্লাসে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়?—কুটনো কুটছে। অমুক কোথায়?—রান্না করছে।—অমুক কোথায়?—জল তুলছে। ব্যস, পড়াশোনা আর হয় না। অবশেষে এই ব্যবস্থা বাতিল করে স্থির হয় প্রতি বছর ১০ মার্চ একটি দিন শুধু গান্ধী পুণ্যাহ নাম দিয়ে এই ব্যবস্থা চলবে। তাই চলছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন তখন কিচেনে এসে শ্রীভবনের বড় মেয়েরা পিঠে বানাত। আমরা খেতাম। একবার পিঠে বানানোর সময় জয়শ্রী চন্দের শাড়িতে আগুন লেগে যায়। পাশে দাঁড়ানো তাঁর সহপাঠী নবকান্ত বরুয়া দ্রুত শাড়ি খুলে নিজের গায়ের চাদর ছুঁড়ে দেন। জয়শ্রীদি বেঁচে যান।

ছোট বড় দুটি উৎসব—আনন্দবাজার ও পৌষ উৎসব। সাহিত্যিকা বিচিত্ররূপায়ণ নাম দিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস বা গো অ্যাজ ইউ লাইক করাত প্রতি বছর পুজোর ছুটির আগে। অবনীন্দ্রনাথের দুই নাতি—অমিতেন্দ্রনাথ (বীরু) ও সুমিতেন্দ্রনাথ একবার বিচিত্ররূপায়ণে যথাক্রমে তালপাতার সেপাই ও ইরানী তরুণী সেজে আমাদের চমকে দিয়েছিল। শিশু বিভাগের ছেলে অতীন্দ্র দত্ত মৌলানা আজাদ সেজে তাক লাগায়। মহেশ জয়শয়াল গোঁসাইজি সেজে বিভ্রম ঘটিয়েছিল। শ্রীভবনের মেয়েরা একবার মহাশ্বেতাদির পরিচালনায় যাত্রীসমেত একটা ট্রেনের কামরা উপহার দিয়েছিল। চিত্রা মজুমদার (বরুয়া) বয়স্ক পুরুষ যাত্রীর ভূমিকায় মজাদার অভিনয় করেন। জয়শ্রী মুখার্জি (রায়) ও ভারতী গুপ্তা (চৌধুরী) হাসির গানের জুড়ি হিসাবে নাম

করেছিল। বিচিত্ররূপায়ণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান আর ছিল মহর্ষি স্মরণ, খৃস্টোৎসব, শিল্পোৎসব এবং সরস্বতী পুজোর সময়ে স্পোর্টস। এই স্পোর্টসে জবরদস্ত দৌড়বাজ ছিল রাণাদা (তপেন নিয়োগী) ও প্রবীর গুহঠাকুরতা। ম্যারাথন রেসে বরাবর প্রথম কলাভবনের প্রাণেশ ভৌমিক। চিত্ত দাস ও শিবু করও ভাল ফল দেখাত স্পোর্টসে। বড় মেয়েদের মধ্যে ভাল দৌড়ত নীলিমা সেন। ছোটদের মধ্যে আলো দত্ত, এখন রায়।

এবারে আনন্দবাজারের কথা বলি। কবি নিশিকান্ত অনেকদিন আগে গান বেঁধেছিলেন আনন্দবাজার নিয়ে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরির বাসিন্দা হওয়ার পরও সেই গান চালু ছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রদের মুখে মুখে। 'চল চল দেখবে মজা আনন্দবাজারে, ছেলেমেয়ে বেচে কেনে কাতারে কাতারে।'

বাংলা আধুনিক কবিতার অন্যতম পুরোধা, সাধক কবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরী এমনি অসংখ্য মজার গান লিখেছিলেন সেকালের শান্তিনিকেতন জীবন নিয়ে। যেমন শান্তিনিকেতনে ঢোকার মুখে মন্দিরের লাগোয়া গোলগাল তালধ্বজ বাড়ির অধিবাসী মোটাসোটা বেঁটেখাটো তেজেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে তাঁর লেখা গানের প্রথম দুটি লাইন হল—

শান্তিনিকেতনে আমি নতুন মানুষ এসেছি;
সেথায় গোলবাড়িতে গোলবাবুকে দাড়ি কামাতে দেখেছি।

বহু আগে পুরানো আশ্রমের মাস্টারমশাইরা থাকতেন লাইন বাঁধা বাড়িতে এক জায়গায়। গুরুপল্লীতে। ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের প্রত্যেকের চালচলন ধরন-ধারণ নিয়ে বাঁধা নিশিকান্ত-সংগীত এখনও জনপ্রিয় শান্তিনিকেতনে। পিকনিক বা একসকার্সনে কেউ না কেউ ওই গুরুপল্লী-বন্দনা গাইবেই। কান্তেশদা থাকলে তো নিশ্চয়ই। ক্ষিতিমোহন সেন মশাই সম্বন্ধে ছিল—

তারপরেতে দাদা ক্ষিতি
দেখে তাঁর লাগে ভীতি,
খোয়াই বেড়ান নিতিনিতি
পাছুতে যান তিনজনা।
(বলে জানাই শোন না, জাননা জাননা)

বঙ্গীয় শব্দকোষ রচয়িতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে—

তারপরেতে বাবু হরি
লিখেন বসে ডিকস্‌নারি
সদাই আছেন কলম ধরি
আজীবন সাধনা॥ (জাননা জাননা)

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে—

তারপরেতে দাদা সত্য
লাইবেরারি কাজে মত্ত,
ম্যালেরিয়ায় ভোগেন নিত্য,
তবু ছুটি মিলল না। (জাননা, জাননা)

নেপালচন্দ্র রায় সম্পর্কে—

তারপরেতে দাদা নেপাল
চকচকে তার মাথা কপাল
ভলিবল বদনা। (জাননা জাননা)

সে অন্য কাহিনী। বলছিলাম আনন্দবাজারের কথা। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার শান্তিনিকেতন নিয়ে যেসব কথা লিখেছিলেন নিশিকান্ত 'সেই ট্র্যাডিশান আজও চলিয়াছে, কোথাও তাঁহার পরিবর্তন ঘটে নাই।'

আগে বুঝতে পারিনি এখন বুঝেছি এই আনন্দবাজার ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের বিদেশীকে স্বদেশী করার আর একটি দৃষ্টান্ত। 'ফেট' বলে একটা বস্তু আছে বিদেশে এবং এখানকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে। কোন একটা সৎকাজে টাকা তোলার জন্যে আট আনার জিনিস

আটষট্টি টাকায় বিক্রি করা হয় একদিনের বিলাসী মেলায়। তাছাড়া থাকে নাচ-গান হল্লা। বেলেল্লাপনার বাড়তি অংশ কচাং করে কেটে রবীন্দ্রনাথ ওই 'ফেট' ব্যাপারটাকে দিয়েছেন নতুন রূপ, বানিয়েছেন পুরোপুরি ভারতীয় এবং ওর গায়ে যে কোন বিলিতি গন্ধ আছে, আজ তা বোঝার উপায় নেই। মেলার অন্তে লাভের টাকা সৎ কাজে খরচ করার মূলনীতিটুকু কিন্তু একই আছে।

আনন্দবাজার অভিনব। বার্ষিক পৌষমেলার খুদে সংস্করণ। তার মেয়াদ একদিনের। ধরা বাঁধা দিন নেই। পুজোর ছুটির ঠিক আগটায় শরৎকাল যখন আসর জমিয়ে বসে শিউলি গাছের তলায়, কাশফুলের আগায়, নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলায়, ঠিক যখনই বাজে ছুটির বাঁশি, সেই সময়টায় বসে আনন্দবাজার।

এই একদিন-কা-মেলার ক্রেতা-বিক্রেতার ঠিকাদার ডেকরেটার ছাত্র-ছাত্রীরা। পুরোনো লাইব্রেরি আর সিংহসদনের মাঝখানে গৌর প্রাঙ্গণে বসে সারি সারি দোকান। প্রাককুটিরের বারান্দা, সত্য কুটির, শমীন্দ্র কুটির, পুরানো ঘণ্টাতলা, পূর্ব তোরণ, পশ্চিম তোরণ—কোন কিছুরই সম্মুখভাগ বাদ যায় না। কোন দোকান একার, কোনটি দলের, কোনটি বিভাগের। পাঠভবন শিক্ষাভবন বিদ্যাভবন কলাভবন সংগীতভবন—সকলেরই আলাদা আলাদা। এবং আলাদা বলেই চলে ভবনে ভবনে জোর প্রতিযোগিতা।

বেশির ভাগই খাবার দোকান। তাছাড়া থাকে সার্কাস, ম্যাজিক, জ্যোতিষী, লটারি, বন্দুকের তাক, খেলনার, ফুলের, হাতের কাজের দোকান। একমাস আগে থেকে চলে জোর প্রস্তুতি। কে কী করছে সবই গোপন রাখার চেষ্টা হয়। বিকিকিনির পর খরচা বাদে যার যা লাভ হয় সব জমা পড়ে কর্তৃপক্ষের হাতে। সব টাকা যায় দরিদ্র ভাণ্ডারে। যে যত বেশি দিতে পারে তার তত আনন্দ—সবার কাছে জয়জয়কার।

মেলার দিন ভোরবেলা থেকে ব্যস্ততার সীমা থাকে না। বাড়ি

থেকে হস্টেল থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে। আগে থেকেই দড়ি বেঁধে নিজের নিজের জায়গা হয় বরাদ্দ। শামিয়ানা তেরপল বাঁশে চটপট উঠে যায় দোকান ঘর। আসে টেবিল চেয়ার তক্তাপোষ শাড়ি ফুলদানি হাতা বেড়ি খুন্তি ডেকচি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুপুর বারোটার পর গৌর প্রাঙ্গণের চেহারা আলাদা। একেবারে অন্য জগৎ। বিচিত্র নামের সব বিচিত্র দোকান যত্রতত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পর্দার আড়ালে একদল মেয়ে বসেছে খাবার বানাতে। চপ কাটলেট স্যাণ্ডুইচ পিঠে কেক সরবৎ অনেক কিছু। ছেলেরা টেবিল সাজাচ্ছে, পেরেক মারছে, বেঞ্চি টানছে। একদল ছোট্ট মেয়ে উত্তরায়ণের ফুলবাগান সাবাড় করে মালা তৈরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফিরি করতে। সং বেরিয়েছে দু-চারজন। আলখাল্লা পরা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় যে ফকিরের ছদ্মবেশে বসে আছে সেগুনতলায়, অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল সে পরিচিত একটি ছেলে। একগাদা গয়না আর মাথায় লাল রুমাল বেঁধে যে জিপসী মেয়ে চাকু বিক্রি করছে, অদ্ভুত সব কথা বলছে, তাকে চিনতে ডাকার দরকার পড়ে শার্লক হোমসের। ফিরিওয়ালায় ছয়লাপ। মেদিনীপুরের বন্যায় ভিখমাগা দলের মতো ডি এল রায়ের সুরের ধরনে একদল ছেলেমেয়ে বিচিত্র পোশাক পরে গানের মিছিল বের করেছে শাল-বীথির রাস্তায়। মৌনীবাবা এক সাধু বসে আছেন পুরনো ঘণ্টাতলায়। পকেটমারের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দু-চারজন।

আসলে পকেটমার অবশ্য খাবার দোকানগুলো। এক টাকার জিনিস তিন টাকা দর হাঁকতে লাজ লজ্জা নেই। লক্ষ্মীকাটরা গণেশ-কাটরার মতো দোকানগুলোর নাম হওয়া উচিত 'গলাকাটরা'। তাছাড়া খাবারের নামগুলোও হয় মজার। কোথাও ফারসি কোথাও তামিল কোথাও সংস্কৃত। ওইসব চলতি ডেভিল বিরিয়ানি পানতুয়া নামের বালাই নেই। ছোলার পিঠের নাম চনক-ঘন, স্যাণ্ডুইচ বালুকণা জাদুকরী। অবস্থা এমন দাঁড়ায় পরিবেশনকারীদেরও নাম

নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হয়। তাই মেনু কার্ডের পেছনে লেখা থাকে খাবারের আসল নাম। নইলে সমূহ বিপদ। কেক খাবেন ভেবে আপনি অর্ডার দিলেন 'দাও তো হে চারখানা কৈকেয়ী'—পরিবেশক নিয়ে এল ঘুগনি।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র, সব খাবারের নাম একবার দিয়েছিলাম তামিল ভাষার অনুকরণে। কোনটা হেৎরে উণ্ডা, কোনটা গাড্ডে মাড্ডে, কোনটা এড়া ইল্লে, কোনটা পদম্পরম। খদ্দের পাকড়াতে আমরা একদল ছেলে দোকানের বাইরে চোঙা লাগিয়ে কোরাসে চিৎকার পাড়ি—হেৎরে উণ্ডা, গাড্ডে মাড্ডে, তৎক্ষণাৎ দলের মেয়েরা ধুয়া ধরে—এড়া ইল্লে, পনম্পরম। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ চিৎকারের জোরেই আমরা অনেক খদ্দের টেনেছিলাম। খাবার খেয়ে কোন ক্রেতাই যে সন্তুষ্ট হননি একথা হলফ করে বলতে পারি। তাছাড়া একটা ছোট্ট সিঙ্গাড়ার নাম যদি হল কুড়ুমুড়ু তিরুকোণ তিরুভুজমূর্তিম এবং তার দাম যদি হয় সাড়ে আঠারো আনা, তাহলে ফরাসী শেফ আনিয়ে খাবার বানালেও বিস্বাদ লাগবে; অবশ্যি সব দোকানেই এক হাল। খাবারের সাইজ যত ছোট দাম তত বড়। একবার একটি দোকানের নাম ছিল ঋণংকৃত্বা। বোঝা যায়নি দোকানীরা ঋণ করে দোকান করল, না ঋণ করে খেতে আসতে প্রলুব্ধ করছে।

মাস্টারমশাই বা আশ্রমের বাসিন্দা অভিভাবকদের আবার বাড়তি বিপদ। একটি দোকানে গিয়ে নিস্তার নেই। চেনা প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেই ঢুকতে হবে এবং দফায় দফায় টাকা গচ্চা দিতে হবে। যিনি যত জনপ্রিয়, তত বেশি ডাক, তত বেশি গচ্চা। বাইরে থেকে যাঁরা যান, তাঁরা মনোহারিণী, বিচিত্ররূপিণী পরিচারিকাদের দেখে বিপদসমুদ্রে ঝাঁপ দেন। পরিচারক পরিচারিকাদের সাজ পোশাক দোকান ও খাবারের নামের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে করা হত। সংস্কৃত হলে উজ্জয়িনীর মালবিকা নিপুণিকা ঘুরে বেড়াত। ফারসী হলে লায়লা মালেকা আবিদারা চোখে বিদ্যুৎ হানত। এ আকর্ষণও কম

নয়। তাছাড়া আর একটি গোপন কথা জনান্তিকে বলি। প্রত্যেক টেবিলে পরিবেশনে থাকে একটি ছেলে একটি মেয়ে। সেই জোড়া ঠিক করতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত। শেষ পর্যন্ত লটারি করে যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে। শুধু তাই নয়, নেপথ্যে খাবার তৈরির জায়গায়ও উৎসাহ প্রবলতর হয়— উৎসাহদাত্রী সঙ্গীটি যদি পছন্দসই হয়।

এই আনন্দবাজারের শুরু শান্তিনিকেতনের সেই আদ্যিকাল থেকে। প্রথম আনন্দবাজার ১৯১৬ সালে। প্রথমবারে রবীন্দ্রনাথ গরহাজির। তিনি তখন জাপানে। পরের বার থেকে তিনি শান্তি-নিকেতন থাকলে আনন্দবাজারে যেতেনই এবং চড়া দামের হাত থেকে তিনিও রেহাই পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত লটারি, পুতুলের দোকান, ফুলের দোকান ইত্যাদিতে যেতেন। তাঁর উপস্থিতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ এনে দিত। ভানুসিংহের পত্রাবলীতে শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে আনন্দবাজারে তাঁর আনন্দ করার এক বিবরণ আছে। এবং চার আনার রুমাল এক টাকায় কেনার কাহিনীও তিনি বর্ণনা করেছেন চিঠিতে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এলে খুশি হত ক্রেতা ছাত্রছাত্রী এবং বিক্রেতা ছাত্রছাত্রী। দিলদরিয়া এই বিপুলবপু মানুষটি অকাতরে পয়সা খরচ করতেন এই খুদেমেলায় এসে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খাবার দোকানে ঢুকলে দাম যত চড়াই হোক না কেন, গাঁটের কড়ি গচ্চা দিতে হত না অন্য কারও। শুনেছি জুতো বুরুশের কাজে নেমে একটি ছাত্র পুরো এক টাকা আদায় করেছিল দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

আগে আনন্দবাজার বসত শালবীথি আম্রকুঞ্জ ঘিরে। এখনকার মতো গৌর প্রাঙ্গনকে কেন্দ্র করে নয়। প্রথমবার মাধবী বিতানে— যেখানে জগদানন্দ রায় অঙ্কের ক্লাস নিতেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এক খাবার দোকান দিয়েছিলেন। মুখে উর্দু, পরনে পশ্চিমী পোশাক। পাগড়ি শিলওয়ার আচকান। খাবার একটিই—কাচালু।

আলুকাবলির ধরণে তেঁতুলজল মেশানো কাঁচা একটি আলুর গায়ে চোরকাঁটা। অঢেল বিক্রি হয়েছিল সেবার। খাবারের উৎকর্ষের জন্যে নয়, দোকানীর উর্দু বয়েৎ আর মুসলমানী আদবকায়দার জোরে।

১৩২৬ সালের পুরানো এক একটি শান্তিনিকেতন পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি সেকালের আনন্দবাজারের এক বিবরণ। সে সময় ছাত্ররা একটি জাদুঘর খুলেছিল—যার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রত্নতত্ত্বগিরি। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। পত্রিকা লিখছে—

শালের ছায়াবীথিতে ছাত্রদের একটি আনন্দবাজার বসিয়াছিল। ছাত্ররা নিজেরাই নানারকম খাবারদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দোকান করিয়াছিল। অনেক ছাত্র নানাবিধ গাছের কাঁটা সংগ্রহ করিয়া একটি পরিদর্শিনী খুলিয়াছিল। যে-সব ছাত্র গান গাইতে জানে, তাহারা প্রত্যেক দোকানে দোকানে গান গাহিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়াছিল। আর একদল ছেলে এক প্রত্নতত্ত্বাগার খুলিয়াছিল। সেখানে ছিল রামের পাদুকা (অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবুর জুতা), অশোকের হস্তলিপি (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম অশোক), বুদ্ধের পাদনখকণা (জনৈক বর্তমান ছাত্রের নাম বুদ্ধদাস) ইত্যাদি। প্রত্যেক দোকানদারের লাভের অংশ অর্ধেক দরিদ্রভাণ্ডারে আর অর্ধেক পত্রিকা বিভাগের তহবিলে দেওয়া হইবে।

১৯৫০ সালে ওদেরই অনুকরণে একটি প্রদর্শনী খুলে দর্শকদের চমকে দেওয়া হয়েছিল। প্রধান উদ্যোক্তা ছিল অমর্ত্যকুমার সেন। প্রদর্শনীতে ছিল গীতার পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ ছাত্রী গীতা সেনের হাতের লেখা। ছিল শিবের জটা। অর্থাৎ ছাত্র শিবকৃষ্ণ করের আঠা লাগানো চুল। আরও এই রকম বিচিত্র সম্ভার।

১৯৫২ সালে এই আনন্দবাজারেই আমি একটি ছড়ার দোকান দিয়েছিলাম। নাম অন্নপূর্ণা কবিতা ভাণ্ডার। সাইনবোর্ডের নিচে লেখা ছিল—এখানে সুলভে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফরমায়েশ-মতো

কবিতা লেখা হয়। অর্ডিনারি চারি আনা, স্পেশাল আট আনা। সাইনবোর্ড লিখে ও এঁকে দিয়েছিলেন রাণী চন্দ। সাইনবোর্ডের উপরে ছিল সিদ্ধিদাতা গণেশের ওল্টানো ছবি। ক্যাপশন—উল্টা গণেশায় নমঃ।

দোকানের সামনে কাউন্টারে বসেছিল আমার দুই এসিস্ট্যান্ট—অমর্ত্য সেন এবং তাঁর সহপাঠী বর্তমানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির খ্যাতনামা অধ্যাপক মৃণাল দত্তচৌধুরী। ছিল একজন রিসেপশনিস্ট—মঞ্জুলা দত্ত।

কাউন্টারের পেছনে এক ঘোরটোপের মধ্যে ছিল ফ্যাক্টরি—কবিতা রচনার কারখানা, অর্থাৎ কাগজ কলম নিয়ে আমি বসে আছি। অমর্ত্য মৃণাল চেঁচিয়ে খদ্দের জোগাড় করে, মঞ্জুলা অর্ডার নেয় এবং নাম বা বিষয়, স্পেশাল না অর্ডিনারি—একটা চিরকুট লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। ঘড়িধরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ডারমাফিক ৮৭টি ছড়া লিখেছিলুম সেবার। তারপর মাথা এমন ঝিমঝিম করতে লাগল, দোকানপাট ফেলে পালিয়েছিলাম এক খাবারের দোকানে। ঝর্ণা বসু, বরেন সেন, কল্যাণী চৌধুরী, সেফি চন্দ, মালবিকা বসু, অনীমা ঘটক, গীতা গাঙ্গুলি আড্ডা মারছিল আর অদ্ভুত কোন নামের খাবার খাচ্ছিল। আমাকে ওরা ডেকে নিল এবং মাথা ঝিমঝিম বন্ধ হল।

আমার খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর প্রবোধ বাগচি, অনিলকুমার চন্দ, রাণী চন্দ, সেকালের চিত্রতারকা সুপ্রভা মুখার্জি, পরবর্তীকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দেবকান্ত বরুয়া, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। দেবকান্ত বরুয়া সম্পর্কে দু'লাইন মনে আছে—

গড়িয়ে চলেন গড়িয়ে বলেন
গড়গড়ানো ভাব,
নিন্দুকেরা নাম দিয়েছে
নরম কচিডাব

ডঃ প্রবোধ বাকচি যখন এলেন, মিলের খাতিরে তাঁকে 'সাকচি' পাঠিয়ে শেষ করলাম 'ত্রাহি ত্রাহি ডাকছি' দিয়ে। সুপ্রভা মুখার্জি সম্পর্কে লেখা ছড়া পরে অন্যভাবে লিখে অন্যত্র ছাপিয়েছি। সেবার লিখেছিলাম—

হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিয়ে
মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ,
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি সি লাহার বিজ্ঞাপন।

'শান্তিদেব ঘোষ, একটুতেই ফোঁস'—এই কথাটি লেখাতে শান্তিদা আমার উপর ফোঁস করে ওঠেন নি, কিংবা অনিলকুমার চন্দের 'গায়ে বদ গন্ধ' দেওয়াতেও অনিলদা ক্ষুণ্ণ হন নি। বুঝেছিলেন সবই মিলের খাতিরে। তবে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপদে ফেলেছিলেন আমাকে। স্পেশাল আট আনা ফেলে দিয়ে ফরমাশ করলেন 'আমার নামে চাই চৌপদী'। চৌপদী লেখার হাঙ্গামা অনেক। আমি ছোট চারটি পদ তৎক্ষণাৎ লিখে বললাম, এটাই চৌপদী—

রথীন্দ্রনাথ,
আজ তার সাথ
মোর মোলাকাৎ
আমি কুপোকাৎ।

আর একজন খদ্দের এসে ফরমাশ দিলেন, 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' নিয়ে ছাড়া বানাতে হবে। তখন দেশে সবে চালু হয়েছে এই প্রজেক্ট। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। কী লিখি? হাতে সময় পাঁচ মিনিট। সময় পেরোলেই পয়সা বাতিল। অবশেষে মাথার চুল ছিঁড়ে কলম কামড়ে অতি কষ্টে লিমেরিক লিখলাম—

প্রজেক্ট কম্যুনিটি
নামটা খিটিমিটি।
ঢালছে টাকা দেদার

রামা, শ্যামা কেদার
টাকায় লুটোপুটি।

আর এক খদ্দের ফরমাশ দিলেন ভারতে মার্কিন সাহায্য নিয়ে ছড়া বানাতে হবে। ঠং করে কাউন্টারে ফেলে দিলেন স্পেশাল রেট-আট আনার আধুলি। ঘেরাটোপের ফাঁক থেকে দেখলাম ক্রেতাটি চেনা—কম্যুনিস্ট। তাঁকে খুশি করার জন্যে লিখলাম—

ডলার মোড়া চার কিনে
টোপ ফেলেছে মার্কিনে।
মিলে সকল পড়শিতে
আটকে গেছি বঁড়শিতে।
ডিসেম্বরের ভর শীতে
রাত কাটাব জার্কিনে।

আরও অনেক ছড়া। সব মনে নেই। তা না থাকুক, আমাদের কালের আনন্দবাজারের স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। সেই দোকান সাজানো, সেই খাবার বিক্রি, সেই সং সেজে রাস্তায় রাস্তায় নাচন কোঁদন—কোনদিন ভুলব না। ভুলব না, মেলার শেষে ফাঁকা দোকানে বসে আড্ডা মারা, গান গাওয়া। সারাদিনের ক্লান্তির পর কেউ মাটিতে, কেউ টেবিলে, কেউ বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে বসেছি। তারই মধ্যে কেউ কেউ পয়সার হিসাব মেলাচ্ছে, কাপ প্লেট গুনছে। অন্য দোকান থেকে দল বেঁধে একে একে আসছে অন্য ভবনের ছেলেমেয়েরা, সবাই গোল হয়ে বসে পড়েছে। তারপর শুরু গান। গানের পর গান। গানের প্লাবন। একটানা কোলাহলের পর শালবীথি তখন চুপ। গৌরপ্রাঙ্গণ চুপ। সারাদেহে ক্লান্তি। পুরানো লাইব্রেরির বারান্দা থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত উদ্দাম কণ্ঠস্বর—'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্মপত্রে জল—।' এই গানের সুর এখনও কানে বাজে, এখনও হঠাৎ বুকে চমক লাগায়।

শ্রীনিকেতনে প্রতিবছর মাঘ মাসে বসত মেলা। ছোটখাট।

গাঁয়ের লোক প্রচুর আসত। প্রদর্শনী হত শাক-সব্জীর। তবে শান্তিনিকেতনের সবচেয়ে বড় পরব পৌষ উৎসব। এখন যেখানে কোআপ, তার পিছন দিকটায় পোড়ান হত বাজি। মেলা বসত উদয়নের সামনের মাঠে। মন্দির থেকে রতনকুঠি যাওয়ার পথে মেলা ছিল দু'ভাগে। বাঁদিকে সৌখীন দোকান আর কলকাতাই শহুরে বাবুদের ছড়ি ঘোরানো। ডান দিকে মোরব্বা জিলিপি রসগোল্লা নিয়ে তারাশঙ্করী গ্রাম্য আবহাওয়া। শ্রীনিকেতনে যাবার রাস্তার দু'ধারে —পান্থনিবাস থেকে উত্তরায়ণের ফটক—বসতো রং-বেরঙের দোকান। কালোর এবং অন্য খাবারের দু'চারটে দোকান বসত মন্দিরের গা ঘেঁসে। বাউল আসতেন একজন দুজন। অনিবার্য ছিলেন নবনীদাস বাউল। তাদের ধুনি জ্বলতো মন্দিরের সামনের বটতলায়। নাগর-দোলা আসতো গোটা তিন-চার। যাত্রা গান, কবি গান—সবই হত মাঠের বাঁ-দিকের ফাঁকা জায়গায়। হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসন হাতাবেড়ি খুন্তির মেলা বসত রতনকুঠির সামনে গোয়ালপাড়া যাবার রাস্তায়। ব্যাস, এই শেষ। এই নিয়েই ছিল মেলা।

শুধু আকারে নয় প্রকারেও মেলা বেড়েছে ইদানিং। উদয়নের সামনের মাঠে শেষ মেলা হয় ১৯৬০। তারপর একষট্টি সালে মেলা বসে এখন যেখানে দর্শনভবন ও বিদ্যাভবন হস্টেল—সেখানটায়। বাষট্টি সালে আবার ঠাঁই বদল। মেলা যায় পূর্বপল্লীর মাঠের পূব দিকটায়। বাষট্টি সাল থেকে চলছে এখনকার জায়গায়। চলছে এবং গায়েগতরে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে বোলপুর ছুঁইছুঁই। এখন পৌষমেলায় মেলাই লোক মেলাই দোকান, সব মিলিয়ে পেল্লাই ব্যাপার।

তবে মেলার চরিত্র মোটামুটি এক। ছাতিমতলায় নয়, ৭ই পৌষের উপাসনা হত মন্দিরের ভিতরে। ১৯৫১ সাল থেকে চলে আসে ছাতিমতলায়। তখন অতিথিদের খাওয়ানো হত জেনারেল কিচেনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই। শালপাতায় খিচুড়ি ডালনা চাটনি

ভাজা। আমরা ছাত্ররা পালা করে পরিবেশন করতুম। অতিথিদের থাকতে দেওয়া হত শান্তিনিকেতন বাড়িতে, সিংহসদনে, সঙ্গীতভবনে। শীত ঠেকাতে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হত খড়। কিছু তাঁবুও পাতা হত। বার্ষিক সমাবর্তন বরাবর হত পৌষমেলার সঙ্গে। বরাবর আসতেন নেহরু, বরাবর বসত আম্রকুঞ্জে। সত্যেন বসু মশাই উপাচার্য হবার পর ১৯৫৭ সালে একটিবার মাত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরায়নের ভিতরে, কলকাতার কায়দায় প্যাণ্ডেল খাটিয়ে। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এসেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। নেহরু স্থান পরিবর্তনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণেই বলেছিলেন, বিশ্বভারতী অনেক বড় হচ্ছে বটে, কিন্তু সরে যাচ্ছে তার মূল স্থান থেকে। ইট আর গোয়িং ফার এয়োয়ে ফ্রম ম্যাঙ্গোগ্রোভ। নেহরুর জন্যেই সমাবর্তন ফের চলে আসে আম্রকুঞ্জে। ষাটের দশকের শেষদিকে সমাবর্তন আর পৌষমেলা হয়ে যায় আলাদা।

মেলার সময় আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নেহরু। তিনি মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। কখনো ছুটে যাচ্ছেন মেলার মাঠে, কখনো কিচেনে সবার সঙ্গে খিচুড়ি খেতে, কখনো বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও তিনি আসতেন। ১৯৪৫ সালে মেলার সময় এসে কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে হঠাৎ উঠে পড়েন নাগর-দোলায়। কোডাক বক্স ক্যামেরায় তোলা সেই ছবি আমার কাছে এখনো আছে।

তখন সমাবর্তন হত শিক্ষাভবনের বিশ্বভারতী কোর্স ও সঙ্গীতভবন কলাভবনের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাধারীদের। আমরা ছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নন-কলেজিয়েট ছাত্র। তাই প্রতি বছর হিংসে হত বিশ্বভারতী কোর্সের ছাত্রদের। ওরা অন্য সিলেবাসে ছিলেন খাঁটি ছাত্র বিশ্বভারতীর। আমরা ছিলাম ভেজাল। সমাবর্তনের পর হত বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভা। অনেক তর্কবিতর্ক হত আম্রকুঞ্জের তলায় মনে আছে, খুব চেঁচাতেন নলিনাক্ষ সান্যাল মশাই।

আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন, পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর ইত্যাদি এখনকার মতো তো ছিলই, আর ছিল চীনাভবনের সামনে ভারত-চীন সমিতির বার্ষিক সভা। নেহরু তাতেও পৌরহিত্য করতেন। প্রায় প্রতিবারই ওই সভার জন্যে আসতেন হোরেস আলেকজাণ্ডার। প্রবীণ নবীন বরণ ব্যাপারটা হালের। পাঠভবনের সমাবর্তনও তাই। নেহরু ছাড়া সরোজিনী নাইডুও আসতেন খুব। তিনি তখন বিশ্ব-ভারতীর আচার্য। পরে, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাওয়ার পর নেহরুর সঙ্গে নিয়মিত আসতেন ইন্দিরা গান্ধী। আর সঙ্গে আসত শাদা পাজামা আর শাদা পাঞ্জাবী পরা ফুটফুটে দুই ছেলে রাজীব আর সঞ্জীব। অনেক পরে জানলাম, সঞ্জীব হয়ে গেছে সঞ্জয়।

সাত আট নয় পৌষ—এই তিনদিনকে আমরা বলতুম সপ্তমী অষ্টমী নবমী। ঠিক দুর্গাপূজার আনন্দ। সারা বছর অপেক্ষা করতুম এই তিনদিনের জন্যে। তখন বাড়তি আকর্ষণ ছিল সাঁওতাল নাচ। ৮ই পৌষের দিন সাঁওতাল নারীপুরুষে ভরে যেত মেলার মাঠ। তারপর সারারাত মাদলের সঙ্গে নাচ। কী একটা কারণে সেই নাচ বন্ধ হয়ে গেল পঞ্চাশের দশকে। মেলার মাঠে যাত্রাগান ছিল বড় আকর্ষণ। তার চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল আমাদের নিজেদের যাত্রা। অবনীন্দ্রনাথের লম্বকর্ণ, হংসনামা, এসপার ওসপার ইত্যাদি অভিনীত হয়েছে মেলার মাঠে যাত্রা হিসাবে। ১৯৫৩ সালে আমার লেখা তেপান্তরের মাঠেও যাত্রা হিসাবে অভিনীত হয়। তাছাড়া গাঁয়ের যাত্রাগানের আগে কমিক হত কিছু প্রাক্তন ছাত্রের। তাতে মুখ্য ভূমিকা নিতেন অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অতুল বসু। বিচিত্র পোশাক পরে বিচিত্র সংলাপে কী মজাদার কাণ্ড ওরা করবেন, আগে আন্দাজ করা যেত না। অজিনদা আর শোভনলালদা—মামা ভাগনে—একবার সিংহসদনে 'হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল' অভিনয় করেন। মনে হয়েছিল আবোল তাবোলের একটি পাতা চোখের সামনে।

১০ পৌষ অর্থাৎ দশমীর দিনে বড়দিন। মন্দিরের খ্রীস্টোৎসব।

মোমবতির আলো জ্বালিয়ে ক্রীসমাস ক্যারোল। কী সুন্দর পরিবেশ আর কী সুন্দর গান—'একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে।' তারপরই দশমীর বিষাদ শুরু হতে না হতেই আনন্দের বাতাস। ওইদিন রাত্রেই এক্সকার্সন যাত্রা। ভুবনেশ্বর, তুমকা, কোডার্মা, রাজগীর, ভীমবাঁধ, ডেহরী অন শোন। এক একবার এক এক জায়গায়। গাড়ি চড়ে দল বেঁধে হৈ হৈ করতে ছুটে চলা অন্যত্র। মেলার দোকানদাররা যখন ঘরদুয়ার ভেঙ্গে তল্পীতল্পা গোটাচ্ছেন, তখন গানের তালে তালে কিংবা বারোয়ারি কবিতা বানাতে বানাতে আমাদের এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে নিয়ে ট্রেনের রিজার্ভ কামরা ছুটে চলেছে অন্ধকার চিরে।

এক একটি ভবন এক এক জায়গায় যেত এক্সকার্সনে। কলা-ভবনের বাঁধা ছিল রাজগীর। শিক্ষাভবনের দলনেতা বরাবর অনিলদা। সঙ্গে রাণীদি ও ছোট্ট অভিজিৎ। একেবারে ক্যাম্প লাইফ। বন্ধন আর একটু শিথিল। পরম আনন্দে কেটে যেত এক হপ্তা। ট্রেনে একসঙ্গে যাওয়া আসা, এক সঙ্গে থাকা এবং সন্ধের পর ক্যাম্প ফায়ারের সঙ্গে গান কবিতা আর নতুন নতুন বুদ্ধির খেলা। অ-রবীন্দ্র সংগীত ছিল বাঁধাধরা কয়েকটি—ইন্দি বিন্দি সিন্ধি, একজন গেল মাঠে, কাটতে গেল কাঠ ইত্যাদি। বুদ্ধির খেলায়—যেমন ওয়ার্ড মেকিং অ্যাকটিং শারাড ইত্যাদিতে যারা পিছিয়ে পড়ত, তাদের জন্যে ছিল নট আই স্যার, বুড়ি-বুড়ি ইত্যাদি খেলা। ভুবনেশ্বর এক্সকার্সনে আমাতে আর আশরাফে কবির লড়াই হয়েছিল। ও কবি আর আমি ছড়াদার। —আশরাফ সিদ্দিকি, খেয়েছে কি সিদ্ধি কি—ইত্যাদি দিয়ে পরপর ছড়া বানানোর পর আমারই জিৎ। চৌধুরী দিয়ে মিল দেওয়া এত সহজ নয় যে। খাওয়া দাওয়া ঘুমানোর কথা ভুলে যেতাম আমরা। সেই সঙ্গে থাকত অনিলদা, রাণীদির সস্নেহ প্রশ্রয়। অনিলদা রাণীদি ছিলেন গান পাগল। সকাল থেকে দুপুর থেকে বিকেল থেকে সন্ধে এক নাগাড়ে গান শুনেও তাদের ক্লান্তি হত না। এক্সকার্সনে সেই

সুযোগ পেতেন তারা—বিশেষ করে অনিলদা। রাণীদি তো চলে যেতেন রান্নাঘরে।

সরকারী এক্সকার্সন ছাড়াও আমরা হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়তাম। একবার আমি, ভুলু ও বরেন সাইকেলে চলে যাই ইলামবাজার। ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে বসে আছি। দূর থেকে বিশ্বজিৎ ইসারা করল 'বেরিয়ে আয়।' সন্তর্পণে বেরোতেই বলল—চল, রাঁচি চলে যাই। সঙ্গে জিতেনদা, খাটোয়ানি, সনৎ, রাণা, শক্তি, অনিল আছে। ক্লাসে বইপত্র ফেলে তক্ষুণি সত্যি সত্যি চলে গেলাম রাঁচি। গাড়িতে। ফিরলাম তিনদিন পর। ঠিক তেমনি সন্ধেবেলা স্থির করে রাত্রের গাড়িতে আমি ভুলু বিশ্বজিৎ আর জিতেনদা চলে যাই রাজস্থান। দিল্লী সেই আমার প্রথম দেখা। চিতোরগড় উদয়পুর আজমীড় তো বটেই। সেই সফরের পর অনেক গল্প হয়েছিল। গল্পগুলি এখনও আমাকে মাঝে মাঝে রসিয়ে বলতে হয়। অনেকে আবার আমাদেরই গল্প অন্য নামে আমাদের শোনায়। যেমন আমার ভুলুর ও বিশ্বজিতের ঘোড়ায় চড়ার গল্প।

এক্সকার্সনের ছোটখাট সংস্করণ ছিল একদিনের পিকনিক। কোপাই নদীর ধারে কিংবা গোয়ালপাড়ায় কিংবা কার্তিকবাবুর বাগানে চড়ুইভাতি ছিল উৎসবের মত। তাছাড়া ছিল ফুলডাঙায় মুনলাইট পিকনিক, পারুলডাঙায় কফি পিকনিক। অ্যাকটিং শ্যারাড, ওয়ার্ড মেকিং গেম অব অ্যাডভার্ব, কনসিকুয়েন্স রিঅ্যাকশন ইত্যাদি খেলার সঙ্গে মাতিয়ে রাখত গান। অধিকাংশই কোরাস। যাবই আমি যাবই, এলেম নতুন দেশে, আমরা নূতন যৌবনের দূত, আমরা লক্ষ্মী ছাড়ার দল, ওগো কিশোর আজি ইত্যাদি গান বিনা রিহার্সেলে কোরাসে যখন গাওয়া হত, তখন মনে হত, রবীন্দ্রসংগীত যেন দলবদ্ধ-ভাবে গাওয়ারই জন্যে লেখা। রস-পিকনিক নামে একটা বস্তু ছিল শীতকালে। শেষ রাত্তিরে উঠে দল বেঁধে গোয়ালপাড়া গ্রামে গিয়ে গাছ থেকে পেড়ে পেড়ে টাটকা খেজুর রস খাওয়া। আমি ঘুমকাতুরে,

তাই যেতে পারতাম না। বিশ্বজিৎ ভুলুরা আসছে টের পেলেই বিছানা ছেড়ে খাটের তলায় চলে যেতাম।

তবে এক্সকার্সনের তুলনা নেই। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করত—আমরা খাসা আছি, হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি। তাছাড়া একসঙ্গে থাকার শিক্ষা হ'ত প্রতিবছর। এখনও মনে পড়ে—ক্যাম্প ফায়ারের আলো নিভু নিভু, বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই চোখে ঘুম নিয়ে শয্যায় নিষ্ক্রান্ত, শেষ রাতে কালো কফির কাপ হাতে নিয়ে যখন বসে আছে চার কি পাঁচটি ছেলেমেয়ে, যখন গাছের পাতারাও অনড়, ঠাণ্ডায় সবাই জড়সড়, ঠিক তখনই বিনা অনুরোধে কেউ ধীরে উঁচু পর্দায় গেয়ে ওঠে—নিশীথ রাতের প্রাণ। শ্রোতা স্তব্ধ প্রকৃতি শ্রোতা নিঃসীম অন্ধকার, শ্রোতা মুগ্ধ সেই চার প্রাণী। তখন মনে হ'ত এই একটি গানের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

৬

আমাদের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। কিন্তু তিনি নেই, কখনও মনে হয়নি। সারাদিন সারা কাজের মাঝে, আকাশবাতাস ফুল ফলের ভিতর তিনি আছেন, এই বোধটাই ছিল। যখন যে দিকেই তাকিয়েছি, মনে হয়েছে, তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু তোমার আশীর্বাদ। সেই কারণেই কত নামীদামী লোক আসতেন, কিন্তু আমরা ভাবতাম তেমন আর কী! ব্যতিক্রম নেহরু ও গান্ধীজি। গান্ধীজির কথায় পরে আসছি।

প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এলে ভাল লাগত। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন আশ্রমিকরা। ইচ্ছে করলে দেশবিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা নিখরচায় থাকতে পারি। একজন প্রাক্তন আর একজন প্রাক্তন দেখলে আত্মীয়ের মত ঘরে টেনে নেয়। তারপর কেবল শান্তিনিকেতনের কথা। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা বেশি আসতেন পৌষ উৎসবে। যে যেখানেই থাকুন, আসা চাই-ই। অনেকটা পুনর্মিলন উৎসব যেন। দীর্ঘকায় সুধীরঞ্জন দাস ও গৌরকান্তি তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই আসতেন। এই দু'জন ছিলেন প্রাক্তনদের অভিভাবকের মত। প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত শিবেন রায় সরোজরঞ্জন চৌধুরী প্রমথনাথ বিশী অজিত রায় হিরেন নন্দী অজয় সেন প্রমুখদের অনবরত আনাগোনা ছিল। প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত (হাবুলদা) পক্ষি-বিশারদ। তিনি এলেই একটা বাইনাকুলার নিয়ে এ গাছ থেকে ওগাছে তাকাতেন। ইন্দুভূষণ রায় কনিষ্ঠ। সব সময় ফিটফাট। তিনি আসতেন সস্ত্রীক। তিনি রানাদা অসীমদা ও প্রসূন চৌধুরী অর্থাৎ পান্নুর মামা। বন্ধুদের মামা তবু শান্তিনিকেতনের সুবাদে ইন্দুদা, আর তাঁর স্ত্রী কিন্তু মামীমা। সিনেমা জগতের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ রায় হরিসাধন দাশগুপ্ত সুশীল মজুমদার রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আসতেন।

৯ পৌষ আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক সঙ্ঘের অধিবেশন। সবাই শালবীথি বরাবর লাইন বেঁধে আসতেন। তারপর হাসিঠাট্টা। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক তর্কবিতর্কও হত। ইন্দুভূষণ পালিত খুব চেঁচামেচি করতেন। কানাইদা হঠাৎ হঠাৎ কড়া মন্তব্য করে অন্যদের অপ্রস্তুত করতেন। হৈ চৈ লেগে যেত। তখন কঙ্করদা (ক্ষেমেন্দ্র মোহন সেন) কোন একটা ছোট্ট রসিকতা করে গোটা ব্যাপারটা হাল্কা করে দিতেন। গোলমাল থামতেই সবাই মিলে গান ধরতেন, 'আমাদের সব হতে আপন।' বুলা মহলানবিশ বা কুলপ্রসাদ সেন জামিয়ারের তলা থেকে বের করতেন বাঁশি, শিবদাস রায় টেনে নিতেন এসরাজ, আশ্রম সংগীতের সুরে ঝলমল করত আম্রকুঞ্জ। তারপর পরলোকগত আশ্রম-বন্ধুদের স্মৃতিবাসর সেরে কিচেনে হবিষ্যান্ন খাওয়া। আতপ চাল, অঢেল ঘি, অঢেল সেদ্ধ ডাল স্টু, দই এবং বোঁদে। মোটাপাড় শাড়িপরা দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী হাসিদি হাসিখুশি হাসুদি লীলাদি কালিদাস নাগ-শান্তিদেবীর তিন কন্যা মঞ্জুদি কিসাদি ও পারমিতা আরতিদি রেণুকাদি ইন্দুদি মৃণালদা জিতেনদা (সেন) সৈয়দদা মণ্টুদা গোপাল রেড্ডি বামন ভাণ্ডারি গোবর্ধন মাপারা বাচ্চুভাই শুক্লা সুধীর খাস্তগীর রণজিৎ গুন—সবাই বসে পড়েন খেতে। অনেক সময় এক সঙ্গে দু'তিন পুরুষ। খাওয়াতো নয় যেন খেতরির মহোৎসব খেতে খেতে চিৎকার—লাগছে কেমন? চিৎকারের জবাবে সমবেত কণ্ঠে পাল্টা চিৎকার—বে—শ।

নিয়মিত আসতেন পুলিনবিহারী সেন, কানাই সামন্ত, অনাদিকুমার দস্তিদার। পুলিনদা গম্ভীর চেহারার লোক। প্রভাতদা, প্রবোধদাদের সঙ্গে তাঁকে বেশি দেখতাম। কানাই সামন্তদা নন্দলাল বসুর সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। পোশাকও নন্দলালের মত। অনাদি

দস্তিদার আসতেন সংগীত ভবনের পরীক্ষা নিতে। চকচকে পালিশ জুতো, ধবধবে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি, গৌরবর্ণ সুদর্শন—যেন জমিদার বাড়ির ছেলে। তাঁকে দেখতাম শৈলজাদার সঙ্গে সংগীতভবন থেকে গেস্ট হাউসে ফিরতে। আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে একমাত্র বিশ্বজিতের সঙ্গে ওঁর ভাব ছিল। একদিন বিশ্বজিতকে কাছে পেয়ে শান্তিনিকেতনের চারদিকে হাত ছড়িয়ে গেয়ে ওঠে—"তোমার এই খেলাঘরে, শিশুকাল কাটিল রে—"। অনাদি দস্তিদার শৈশব থেকেই এখানকার ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁকেই বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের আচার্য করতে। তাঁর সেই মনোবাসনা একটা চিঠিতে ব্যক্ত করেছিলেন ১৯২০ সালে। আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু কে জানত, আটান্ন সালে তাঁরই কন্যা সুনন্দাকে আমি বিয়ে করব। মনে পড়ছে, পৌষ উৎসবে হবিষ্যান্ন খাচ্ছি অন্যদের সঙ্গে আমি ও সুনন্দা। হঠাৎ ওড়িশার মালতী চৌধুরী ছুটে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন, বলেন, "অনাদিদার মেয়ে জামাইকে দেখতে এলাম। জানতো, আমি আর অনাদিদা একসঙ্গে বীণা শিখতাম।" পুরনো সুখস্মৃতিতে মগ্ন একজন মাননীয়া বয়স্কার এইভাবে এসে কথা বলায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

রাজশেখর বসু একবারই আসেন ভুবনডাঙার মাঠে নাটক দেখতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এসেছেন দু-একবার। এসেছেন অমিয় চক্রবর্তী, প্রশান্ত মহলানবিশ, কালিদাস নাগ, অপূর্বকুমার চন্দ, নির্মল সিদ্ধান্ত। অমল হোম ছেচল্লিশ সালে পুজোর ছুটি সপরিবারে কাটিয়েছিলেন শ্যামলীতে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনকেও দেখেছি সস্ত্রীক। সস্ত্রীক আসতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দূর থেকে দেখতাম, আর মনে হত, আমার একজন প্রিয় লেখকের সঙ্গে আলাপ করলেই তো হ'ত। তাঁর দুই ছেলে—মৃন্ময় ও হিরণ্ময় এবং মেয়ে মাধবী ওখানে পড়ত। ওদের নাম নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তীর

একটা গল্প আছে। প্রেমেনদা নাকি প্রথমে নাম রাখেন মাধব ও মৃন্ময়ী। সেকেলে নাম। শিব্রামদাই নাকি একটু পাল্টে করে দেন আধুনিক মাধবী ও মৃণ্ময়।

বুদ্ধদেব বসু পঁয়তাল্লিশ সালের গোড়ায় প্রাক্তনী বাড়িতে এসেছিলেন সপরিবারে। মিমি রুমিরা তখন খুব ছোট। সামান্য পরিচয়ের সুযোগে কবিতা পত্রিকার জন্যে অতি কাঁচা একটি কবিতা পাঠাই। তিনি পত্রপাঠ অসামান্য একটি উত্তর দেন, বলেন, শীতের শান্তিনিকেতনে পাতা ঝরা থেকে যেন শিক্ষা নিই। অন্নদাশঙ্কর ও সজনীকান্তকে মাঝে মাঝে দেখা যেত। অন্নদাশঙ্কর তো পরে শান্তি-নিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁর ছেলে একালের খ্যাতনামা ভাষাবিদ পুণ্যশ্লোক, আনন্দরূপ, জয়া, তৃপ্তি, ছাত্রছাত্রী হয়ে যায়। স্ত্রী লীলা রায় হন আশ্রম জীবনের প্রয়োজনীয় একজন। সজনীকান্তের বাড়ি ছিল বোলপুরে। সৈয়দ মুজতবা আলি প্রাক্তন ছাত্র। তখনও তাঁর এত নামডাক হয়নি। সবে লিখতে শুরু করেছেন সত্যপীর ও টেঁকচাঁদ ছদ্মনামে। তিনি সেবারে এসে উঠেছিলেন মসোজির বাড়ি। তাঁর সুদর্শন চেহারা আর বাকবৈদগ্ধ্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। আড্ডায় আসর জমাতে তিনি ছিলেন পয়লা নম্বর। পরে পাকাপাকি শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হন। প্রায়ই আসতেন নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, সঙ্গে ছোট্ট মেয়ে নবনীতা। আর আসতেন মৈত্রেয়ী দেবী। আমাদের সাহিত্যিকার সভায় তিনি কয়েকবার কবিতা আবৃত্তিও করেছেন। বনফুল একবার এসে সাহিত্যিকায় সভাপতিত্ব করেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি একবার।

রবিশঙ্কর একবার বাজিয়ে গেছেন—আটচল্লিশ সালে। আর আসতেন জর্জদা—দেবব্রত বিশ্বাস। ৭ পৌষ মাঝ রাত্তিরের ট্রেনে এসে পৌঁছতেন। পৌঁছেই সোজা মেলার মাঠে। মুখে পান কাঁধে ঝোলা। ঝোলায় একটি কম্বল। তাঁকে দেখতে পেলেই 'জর্জদা এসে গেছেন' চিৎকার শোনা যেত। তারপর কালোর দোকানে গানের পর গান।

সঙ্গে কাপ প্লেটের টুংটাং, খাবার টেবিলে তবলার ঠেকা। অসিতবরণ তখন নামকরা অভিনেতা। তাঁকেও দেখেছি। আসতেন অমর মল্লিক, ভারতী দেবী। ভারতীর ছোটভাই অরুণ দাস স্কুলে পড়ত। যেমন মেয়ে নূপুর যখন কলেজে পড়ে, মলিনাদেবী ও জলু বড়াল প্রায়ই আসতেন। জহর রায় তখনও নাম করেন নি—পাটনা থেকে এসে চীন ভবনে হাস্যকৌতুকের এক অনুষ্ঠান করেন। পি সি সরকার (সিনিয়র) শ্রীনিকেতনে একবার ম্যাজিক দেখান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন খুব জনপ্রিয় গায়ক। তিনি একবার এসেছিলেন মনে পড়ছে। শ্রীভবনের মেয়েরা ছুটেছিল তাঁকে দেখতে। সলিল চৌধুরী নাম হওয়ার পর আসেন একবার। গানে মাতিয়ে দেন। পঞ্চান্ন সালে নির্মলেন্দু চৌধুরী সদলে এসে লোকসঙ্গীতের তুফান ছুটিয়ে দেন। শান্তিনিকেতন-বাসী পায় নতুন স্বাদ। প্রাক্তন অধ্যাপক বলরাজ সাহানীরও আনাগোনা ছিল। রাধামোহন ভট্টাচার্য খুব আসতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন সুনীলচন্দ্র সরকার। তিনি একবার আমাদের কীর্তন গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উত্তমকুমার আসতেন বীরভূমে আউটডোর সুটিংয়ের ফাঁকে।

তটিনী দাস ও সরোজরঞ্জন দাস আসতেন মাঝে মাঝে। সরোজ দাস মশাই কিছুদিন আমাদের লজিক ক্লাস নিয়েছিলেন। যেমন নিতেন কান্টবিশারদ রাসবিহারী দাস। শহীদুল্লাহ সাহেব, জসিমুদ্দিন, আবদুল ওদুদকে দেখেছি। জসিমুদ্দিন সাহেব একবার পৌষমেলার মাঠে কবির লড়াই শুরু করেছিলেন। দেখেছি ফকরুদ্দিন আলি আমেদকে। আমাদের কলেজের মুনলাইট পিকনিক হচ্ছে। হঠাৎ এসে হাজির ফকরুদ্দিন ও অরুণকুমার চন্দ—দুই বন্ধু। অরুণ চন্দের ছোট ভাই অনিলদা। ওঁরা দুজন আমাদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া করেন। যদুনাথ সরকারকে একবার মাত্র দেখেছি। খ্যাতনামা বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ যেবার আসেন, খুব হইচই হয়েছিল। আসতেন শিল্পী মনীষীদা ও সুহাস দে। মনীষীদার সঙ্গ ছিল একটা

শিক্ষা। রাণীদির দাদা ও ভাই হওয়ার সুবাদে এদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল।

প্রাক্তন ছাত্র না হয়েও আসতেন কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণ ও মনোজ ভট্টাচার্য—সুকান্তের জেঠতুতো দাদা। এতবার এসেছেন এবং এত মিশেছেন যে, তাঁরা প্রাক্তন ছাত্রের মতই। মনোজদার মত শান্তিনিকেতনপ্রেমী আমি খুব কম দেখেছি। আর আসতেন মায়া-নন্দনের মা-বাবা কোচাদি নিতাইদা এবং ডঃ সুহৃদ সিংহ। অধ্যাপক অসীমকুমার দত্ত খুব আসতেন। তিনি কিছুদিন ইতিহাসের অনার্স ক্লাসও নিয়েছেন। ছাত্রী ছিল মাত্র একজন—ফরিদা মালিক। অসীমদা অনিলদার ভাগনে।

মণীশ ঘটক আসতেন কখনো সখনো। তাঁর দীর্ঘ চেহারা ছিল আকর্ষক। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন দু-একবার। পৌষমেলায় নিয়মিত আসতেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—দুই ভাই। পূর্ণেন্দু পত্রী তখনও বিখ্যাত হয়নি। সে প্রায়ই আসত। একবার পৌষমেলায় ঠকঠক শীতের রাত্তিরে এসে হাজির। এসেই সারারাত মেলার স্কেচ করেছিল—গরুর গাড়ির তলায় শুয়ে আছে সাঁওতাল, জিলিপি ভাজছে ময়রা, খড় জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে গাঁয়ের লোক। কিঙ্করদার ছবিগুলো ভাল লেগেছিল। চিত্র-পরিচালক বিমল রায় এবং ক্যামেরাম্যান সৌরিন সেন এলেই সর্বত্র ছবি তুলতেন। শম্ভু সাহাও তাই। নরেশ গুহ একবার এসে আমার সঙ্গে হস্টেলে ছিলেন। নিয়মিত আসতেন আনন্দবাজারের অশোককুমার সরকার।

তবে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যিকদের মহোৎসব হয়েছিল তিপান্ন সালে—সাহিত্যমেলায়। দুই বাঙলার নামকরা সবাই এসেছিলেন, তিন-চারদিন ধরে আলোচনা চলেছিল। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, অজিত দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, শামসুর রহমান, কাজি মোতাহার হোসেন (সনজিদা ও ফাহমিদার বাবা)—অনেকে

এসেছিলেন। মোতাহার হোসেন সাহেব তাঁর সরস বক্তৃতায় সকলের মনোহরণ করেছিলেন। সাহিত্যমেলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দুই সচিব গৌরী (আইয়ুব) দত্ত ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়। নিমাই ভাল ছড়া লিখত। এখন লণ্ডন প্রবাসী। তখন বসন্তোৎসব ছিল। অতিথিদের জন্যে জ্যোৎস্নাঢালা গৌরপ্রাঙ্গণে খোলা আকাশের তলায় চিত্রাঙ্গদা হয়েছিল।

গান্ধীজীর ছেলে দেবদাস গান্ধীকে একবার দেখেছি। তাঁর মেয়ে তারা ছাত্রী হন পঞ্চাশের দশকে। অর্থনীতিবিদ ডঃ জ্যোতি ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় তখনই। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিশ্রাম নিতে আসেন অসুস্থ ইউসুফ মেহেরালি। মালঞ্চ বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন। জয়প্রকাশ আসেন স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে নিয়ে। রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাধাকৃষ্ণণ, কৃষ্ণ মেনন, সৈয়দ মামুদ, বিনোবা ভাবে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রফুল্ল ঘোষ যখন প্রথমবারের মুখ্যমন্ত্রী, নির্বাচনে দাঁড়ান বীরভূম থেকে। তিনি তখন আসেন একবার। বাংলার শেষ গবর্নরও আসেন সেপাই-সান্ত্রীকে জাঁকিয়ে, মোটর হাঁকিয়ে। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এসেছেন কয়েকবার। তাঁর মেয়ে ঋতা ছাত্রী ছিলেন কিছুদিন।

আগেই বলেছি, সরোজিনী নাইডু আসতেন প্রতি বছর, ছিলেন উপাচার্য। সর্বদা হাসিখুশি, মুখে একটা না একটা রসিকতা। থাকতেন উদয়নে। একদিন বিকেলে গেছেন কোনার্কে অনিলদার বাড়িতে। রাণীদির তখন খুব নাম। ঘরোয়া জোড়াসাঁকোর ধারে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে দেশে বিদেশে। সরোজিনী নাইডু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসে বললেন, "অনিল, তুমি কিচ্ছু না। দেখতো, রাণীর কত নাম ডাক।' হাজির জবাবে অনিলদার জুড়ি নেই, তৎক্ষণাৎ বললেন, "ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। আমার অবস্থা অনেকটা আপনার স্বামীরই মত। আই অ্যাম সরোজিনী নাইডুজ হাজব্যাণ্ড।" সরোজিনী হাসতে হাসতে

অনিলদার গালে একটা মিষ্টি চড় লাগান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পঁয়তাল্লিশ সালে আসেন আচার্য কৃপালনী। তাঁর শ্বাশুড়ি প্রেমবালা মজুমদার থাকতেন শান্তিনিকেতনে, তাই বলতেন, 'শ্বশুরবাড়ি এসেছি।' অনিলদা কৃপালনীজীকে কলেজ হস্টেলে নিয়ে আসেন। দ্বারিক বাড়ির দোতলায় তার সঙ্গে আমরা অনেকে বসি।

আলাউদ্দিন খাঁ যেবার অতিথি-অধ্যাপক হয়ে আসেন, তিনি সাড়া তোলেন আশ্রমে। সঙ্গে ছিল তাঁর নাতি আশিস। ছুটির দিন সকালে বিকালে এবং অন্যদিন সন্ধ্যায় তিনি নাতিকে নিয়ে সরোদ বাজাতেন সংগীতভবনে এবং বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মকথা বলতেন। সেই বলাটা টুকে নিয়ে শুভময় লেখে 'আমার কথা' নামে তাঁর জীবনী। সরোদ শুধু নয়, মাঝে মাঝে বেহালা ও তবলা বাজাতেন। হঠাৎ গানও গেয়ে উঠতেন—"মন মাঝি বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না!"

কৃষ্ণ রতনজঙ্করকে দেখেছি একবার। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—যার নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন গোঁফেশ্বর—আসেন তার পরে। তিনি তখন অসুস্থই, থাকতেন তাঁর ভাইপো অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। অশেষদার মত গুণী শান্তিনিকেতনেও বিরল। এসরাজ, সেতার, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে অতুলনীয়। বিষ্ণুপুরের অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি। অশেষদার এসরাজ কথা বলে। নৃত্যনাট্যে তিনি একাই মাতিয়ে রাখতেন ফাঁকপূরণের বাজনায়। সেই অশেষদাই যখন কলা-গলা দলের হয়ে ফুটবল মাঠে নামতেন, তখন দুর্ধর্ষ হাফব্যাক। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিয়মিত আসতেন সুচিত্রাদি। পোশাকী অনুষ্ঠান, ঘরোয়া গানের আসর—সর্বত্র তিনি অদ্বিতীয়া। হৈ হৈ করতেও তিনি ওস্তাদ। নাগরদোলায় চড়ছেন, কালোর দোকানে গান গাইছেন, রাত জেগে যাত্রা দেখছেন, পায়ে হেঁটে খোয়াই ছুটছেন—এমন অফুরন্ত প্রাণবন্ত মানুষ কম।

নেপালের রাজা মহেন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানানো হয় আম্রকুঞ্জে।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর প্রথম দেশিকোত্তম উপাধি দেওয়া হয় এলিনোর রুজভেল্টকে। তিনি কিন্তু পরে দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনের নিন্দা করেন। সাতান্ন সালে চু এন লাইও দেশিকোত্তম হন। তিনি মাত্র একদিন থেকে শান্তিনিকেতনের আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। কিচেনে তো খেয়েছিলেনই, সংগীতভবনে গিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে মণিপুরী নাচও নেচেছিলেন। তিনি যেদিন শান্তিনিকেতনে, সেইদিনই ইতালির চিত্র পরিচালক রোজেলিনিও এসেছিলেন। সারা দিন থেকে বিকেলে স্পেশাল ট্রেনে চু ফিরছেন কলকাতায়। সঙ্গে উপ-বিদেশ মন্ত্রী মার্শাল হো-লুং। বোলপুরে এসেছেন উপাচার্য সত্যেন বসু ও অনিলদা। হো-লুং তান ওয়েন ও তান চামেলিকে ট্রেনের কামরায় তুলে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' অনিলদা কপট ক্রোধে চু-কে বলেন, 'প্রাইম মিনিস্টার, ইয়োর মার্শাল হ্যাজ কিডন্যাপ্ড টু ইয়াং গার্লস।' সত্যেন বসু মশাই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, 'দে আর দি ফ্রুটস অব মার্শালস ভিক্টরি।' চু-এন-লাই হেসে অস্থির।

পঁয়তাল্লিশ সালে রাজীব যখন একেবারে শিশু, ইন্দিরা যখন ওকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে, গান্ধীজি আসেন সেই সময়। গান্ধীজি যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তখন মায়ের কোলে রাজীব উত্তরায়ণের ফটকের সামনে আধো আধো গলায় বলে—'বাপু, জায় হিন্দ।' অর্থাৎ জয়হিন্দ। তখন নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্যে ওই জয়হিন্দের জয়জয়কার। তার দেড় বছর পর স্বাধীনতা, দেশ বিভাগ। দেশ বিভাগ ব্যাপারটা যে কত বেদনাদায়ক কত সাংঘাতিক স্বাধীন হওয়ার আনন্দে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভুলিনি। গৌরপ্রাঙ্গণে উৎসবের পর সাঁওতালী মাদল কাঁধে আমরা কয়েকজন সারারাত নেচেছিলাম।

গান্ধীজির কথায় এবার আসি। আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। যাঁরা সে সময় ছিলেন, সকলের কাছেই অমূল্য অভিজ্ঞতা তাঁর আগমন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান—যার সঙ্গে গান্ধীজিরও যোগ

১৯১৫ সাল থেকে—কেমন চলছে দেখতেই তিনি সেবার আসেন। সেই শেষবার।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর। তাঁকে আমি দেখি সেই প্রথমবার। 'গান্ধীজি' নামের মধ্যে কী জাদু, আজকালকার ছেলেরা বুঝবে না। তাই যখন শুনলাম, গান্ধীজি এবার এসে বেশ কয়েকদিন থাকবেন তখন আমরা যেমন তাঁকে দেখার জন্যে অধীর হয়ে উঠলাম, তেমনি সারা শান্তিনিকেতনে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল। আবার আমার মনে গান্ধীজি নিয়ে কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্বও ছিল। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের লালকেল্লা-বিচারের সময়। শুধু নেতাজী নন, ফৌজের তিন সেনাপতি শাহনাওয়াজ, শেগাল ও ধীলন সব তরুণ ভারতীয়ের হীরো। আমার বয়স তখন কম, তদুপরি কলেজের নিচু ক্লাসে পড়ি, মনটা স্বভাবতই এদের অনুকূলে এবং অকারণেই গান্ধীজিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ বলে ধরে নিয়েছিলাম। তাই সেদিন যখন গান্ধীজি স্পেশাল ট্রেনে বোলপুর স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটেই শান্তিনিকেতনে রওনা দিলেন, আমরা ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে স্বাগত জানাতে আশ্রমের ভিতরে রাস্তার দু-ধারে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইতিমধ্যেই আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, গান্ধীজি যখন আমার সমুখ দিয়ে যাবেন, কিছুতেই মাথা নত করব না। কিন্তু মুহূর্তে ব্যাপারটা হয়ে গেল অন্যরকম। গান্ধীজি ভুবনডাঙা পেরিয়ে নিচু বাংলো পাড়ার পাশে বড় রাস্তা বরাবর হিন্দীভবনের লাগোয়া আশ্রমের সদর ফটক দিয়ে ঢুকলেন, নেপাল রোড ধরে চীনভবন, বেণুকুঞ্জ পেরিয়ে এগোতে লাগলেন ভিতরে। আমি দাঁড়িয়ে আছি চৈত্যের সামনে। পিছনে দু'পাশে প্রচুর লোক। তারই মাঝখানে দুজন মহিলার—সুশীলা নায়ার ও আভা গান্ধী—কাঁধে ভর করে গান্ধীজি এগিয়ে আসছেন। আমি নড়ে-চড়ে উঠলাম, কিন্তু মাথা নত না করার পূর্ব প্রতিজ্ঞায় অটল। পায়ে স্যাণ্ডেল, হাঁটুর উপর সাদা ধবধবে ধুতি, কোমরে গোঁজা ট্যাকঘড়ি, খালি গা, মুখে বিশ্ববিখ্যাত

সেই শিশুর হাসি—গান্ধীজি একেবারে সামনে এসে পড়েছেন এবং বাঁ-দিকে তাকানো মাত্র তাঁর চোখ পড়ল আমার চোখে। ব্যস, আমার সব প্রতিজ্ঞা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার। মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো আমার মাথা শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় আপনা-আপনি নত হয়ে পড়ল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁকে প্রণাম জানাতে বাধ্য হলাম।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গান্ধীজি সোজা চলে গেলেন গৌরপ্রাঙ্গণে। সেখানে আগে থেকেই হয়েছে উপাসনার ব্যবস্থা। গান্ধীজি বসলেন ছোট্ট একটি মঞ্চের উপরে। খোলা আকাশের তলায়। চারদিকে বসে আছি আমরা। 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গানটি শেষ হওয়ার পর শান্তিদেব ঘোষ তাঁর অবিস্মরণীয় কণ্ঠে পশ্চিমের লাল আকাশ, শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, গৌরপ্রাঙ্গণ—সব কাঁপিয়ে দিয়ে চড়া গলায় গান ধরলেন—'ওই আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রবো।' গান্ধীজি মাথা ঈষৎ নিচু করে গান শুনছেন এবং সেই মুহূর্তে আমারই চোখের সামনে নন্দলাল বসু ক্ষিপ্রবেগে এঁকে ফেললেন সেই পরিচিত এবং বিখ্যাত ছবি—'প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি'। গান থামার পরেও তার রেশ যায়নি এবং ধীরে অত্যাশ্চর্য কণ্ঠে গান্ধীজি শুরু করলেন প্রার্থনান্তিক ভাষণ—'শান্তিনিকেতন কী মেরে ভাইয়ো, আউর বাহিনো—' আমার সমস্ত শরীরে তখন শিহরণ। ভাষণ তো নয়, যেন দৈববাণী। সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম একজন মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বে। শুধু আমি নই, সেদিন সেই উপাসনাস্থলে উপস্থিত সকলেরই এক অবস্থা।

গান্ধীজির থাকার জন্যে নির্দিষ্ট বাড়ি ছিল উত্তরায়ণের ভিতর 'শ্যামলী'। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় ১৯৪০ সালে গান্ধীজি যখন কস্তুরবা সহ শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন ওই মাটির বাড়িটি তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়। সেবারই অর্থচিন্তায় ক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ একটি বন্ধ খামের ভিতর চিঠি লিখে গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন তাঁর অবর্তমানে শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব যেন মহাত্মাজি নেন। রবীন্দ্রনাথ যখন মারা যান গান্ধীজি তখন জেলে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আশ্রমে আসেন।

গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশমত শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব দেন জহরলাল নেহরুকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাই জহরলাল সংসদে আইন পাশ করে বিশ্বভারতীর যাবতীয় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন

গান্ধীজি তাঁর বিরাট দলবল নিয়ে শ্যামলীতে উঠলেন। শ্যামলী আর কোণার্কের মাঝখানে যে চাতাল, সেখানেই অবশ্য তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটত। ভোর বেলা গান হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্ধ গায়ক কালু মিঞা প্রায়ই সকাল সন্ধ্যা গান্ধীজিকে গান শোনাতেন। গানের পর তিনি বেড়াতে বেরোতেন খোয়াইয়ের দিকে। ফিরে এসে দেখা সাক্ষাৎ, নানা কাজকর্ম। সেবার তাঁর প্রধান কাজ ছিল শান্তি-নিকেতন আর শ্রীনিকেতনের মাঝখানে দীনবন্ধু এনড্রুজ হাসপাতালের শিলান্যাস। এনড্রুজ ছিলেন গান্ধীজির প্রাণের বন্ধু। গান্ধীজি হেঁটেই রওনা দিলেন শ্রীনিকেতন। আমরা দল বেঁধে চলেছি তাঁর পিছে পিছে। মনে আছে, মহাজন যেন গতাঃ স পন্থা—এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে আমি হাঁটছিলাম গান্ধীজির ঠিক এক পা পেছনে। উনি ঠিক যে জায়গা থেকে পা তোলেন, তৎক্ষণাৎ সেখানে আমার পা পড়ে। গান্ধীজি এত দ্রুত হাঁটেন যে তাল রাখতে গিয়ে আমাকে প্রায় দৌড়তে হয়েছিল। ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল, যখন গান্ধীজি হঠাৎ একদিন শিল্পী মুকুল দের ষ্টুডিও দেখতে রওনা হন। নন্দলাল বসুর সঙ্গে দেখা করতে কলাভবনেও তিনি গিয়েছিলেন একদিন।

আমি ছিলাম উত্তরায়ণের অন্যতম ভলানটিয়ার। আমাদের কাজ ছিল লোকজন ফটকে আটকানো। একদিন দুপুরের দিকে গান্ধীজি গায়ে তেল মাখছিলেন। মাসাজ করে দিচ্ছিলেন তাঁর নাতি কনু গান্ধী। এমন সময় একজন ফটোগ্রাফার এসে বললেন, ভিতরে যাব। আমি বললাম, যাবার হুকুম নেই। তখন উনি বললেন, "আমি আনন্দবাজারের বীরেন সিংহ।" আমি আবার বললাম, আনন্দবাজার হোক আর যা-ই হোক, সিংহ হোক আর বাঘ হোক, ভিতরে যেতে দিতে পারি না। ভদ্রলোক চলে গেলেন, তারপর খানিক বাদে

আর একজনকে নিয়ে এলেন। হন হন ছুটে আসা দ্বিতীয়জন এসেই আমার উপর একচোট হম্বিতম্বি শুরু করে দিলেন। আমি তো ভয়ে জড়সড়। গেলাম রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। রথীদা বললেন, "ও, আনন্দবাজার, আচ্ছা, ভিতরে যেতে দাও।" পরে জেনেছিলাম, দ্বিতীয় ভদ্রলোক কানাইলাল সরকার, পরে যিনি আমার প্রিয় কানাইদা হন। সেবার রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের টাকা তোলা সম্পর্কে গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলতে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশাইও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

গান্ধীজি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার দিন সকালবেলা উত্তরায়ণে উদয়ন বাড়ির সামনে বিশ্বভারতীর সব কর্মীর সঙ্গে মিলিত হন। উপদেশ দেন, কীভাবে চলতে হবে। দু'চারজন কর্মীকে কটু কথাও বলেন। সভা ছেড়ে আবার ছুটে [illegible] [illegible] চলি বোলপুরে।

সেই গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদ পেলাম শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি সেই মন্দির প্রাঙ্গণে, যেখানে গান্ধীজির উপাসনাসভা বসেছিল, আশ্রমের সবাইকে জড়ো করে ক্ষিতিমোহন সেন মশাই ঘোষণা করলেন, মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ। উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমিও সেই সন্ধ্যায় অঝোরে কেঁদেছিলাম।

৭

আটচল্লিশে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে শান্তিনিকেতন ছাড়ার পালা। কত সুখের স্মৃতি, কত আনন্দের স্মৃতি। লেখাপড়া খেলাধূলা, গান আড্ডায় ফলন্ত দিন। এখানে এসে ভালবাসলাম প্রকৃতিকে, জানলাম স্বদেশকে, শিখলাম মানুষকে মর্যাদা দিতে। এবার বিদায়। বিদায় শালবীথি, বিদায় দ্বারিক, বিদায় খোয়াই। বন্ধুদের কাছ থেকে জনে জনে বিদায় নিয়ে, গুরুজনদের প্রণাম করে গেলাম কোণার্কে। অনিলদা-রাণীদির কাছে। পায়ে হাত দিতে যেই ঝুঁকেছি, বুকের জমা কান্না হু-হু করে বেরিয়ে পড়ল চোখের জল হয়ে। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রাণীদি বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গোছগাছ সারা। খাটের তলা থেকে বের করেছি ধুলিমলিন জুতো। বেঁধেছি বিছানা। লক্ষ্মণ, পশুপতি, সাতকড়িদা, হরিপদদা দাঁড়িয়ে। খোঁজ নিতে এলেন ভুজঙ্গদা। স্তব্ধ গন্ধরাজচক্র, স্তব্ধ আম্রকুঞ্জ। শিশুবিভাগের ভোলা কুকুরটা লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে। মাসিমা কণা দত্ত ছোটদের জন্যে আচার বানাতে বানাতে এগিয়ে এলেন বিদায় দিতে। রিক্সা ডেকে বোলপুরের পথ ধরলাম। সামনে অন্তহীন পথ। বড় রাস্তা ধরার মুখে দেখি অনিলদা রাণীদি কোণার্ক থেকে এসে দাঁড়িয়ে। হাত নাড়ছেন।

এই হাতছানি আমাকে শান্তিনিকেতনে ডেকে আনছে বারবার। কলকাতায় গেলাম এম.এ. পড়তে। কিন্তু সে যেন নির্বাসন। সুযোগ পেলেই শান্তিনিকেতনে পালিয়ে আসি। উঠি কখনো হস্টেলে, কখনও ভুলুদের বাড়িতে। আলাপ হয় নতুন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে, নতুন অধ্যাপকের সঙ্গে। ওদের সঙ্গেই যাই এক্সকার্সন পিকনিক, যেন ছাত্রই আছি। তবে কলকাতা শান্তিনিকেতন যাতায়াত বেশিদিন

চলল না। এম.এ. পরীক্ষা দিয়েই কাউকে কিছু না বলে, কোথায় থাকব ঠিক না করে, সোজা শান্তিনিকেতন চলে এলাম। আর কোথায়ই বা যাব! এসে দেখি বেশ কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। ১৯৫১ সালে হল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মৌলানা আজাদ এসেছিলেন সেই উপলক্ষে। রথীন্দ্রনাথ উপাচার্য। নন্দলাল অবসর নেওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ কর কলাভবনের অধ্যক্ষ, ক্ষিতিমোহন সেনও অবসর নেওয়ার মুখে, শান্তিদেব ঘোষ সংগীত ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনিলদা লোকসভা নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হয়ে চলে গেলেন দিল্লি। হীরেনদা হলেন কলেজের প্রিন্সিপাল। দিল্লি যাবার আগে অনিলদা বলে গেলেন, "হীরেনবাবু, অমিতাভকে দিয়ে দু'একটা বাংলা ক্লাস নেওয়াতে পারেন।"

ক্লাস নিতে লাগলাম বেসরকারীভাবে। ঠাঁই পেলাম সেই পুরোনো কলেজ হস্টেলে। হস্টেল আগেকার মতই জমজমাট, আকারে আরও বড় এবং নতুন এক আরও কয়েকটি। আমি, অভিজিৎ চন্দ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও কেনিয়ার ছাত্র টম একেলো এক ঘরে। সুরজিৎ তখন থেকেই সাহিত্য-পাগল, জলার্ক কাগজ সম্পাদনা করে, নানা কাগজে লেখে। একালের শিল্প সমালোচক প্রণবরঞ্জন রায় থাকত পাশের ঘরে। আর সেদিনের সেই ছোট্ট অভিজিৎ কলেজের ছাত্র হয়ে মস্ত জোয়ান। মা-মামাদের স্বভাবে সে সব সময় ছবি আঁকত। সেজমামা মনীষীদার প্রভাব ছিল বেশি। কিন্তু আঁকার দিকে গেল না। উল্টে তার মাসতুতো দুই ভাই—বাচ্চু ও ছোটন এবং দীপকভাই প্যাটেল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, তরুণ রায়, সুনীল সখা তাদের নিয়ে তৈরি করে এক দুর্ধর্ষ উৎপাত বাহিনী। ভূতের ভয় দেখানো, মুর্গি চুরি, ঘুমন্ত অবস্থায় খাটসুদ্ধ মাঠে নিক্ষেপ ইত্যাদি নানারকম অকাজে ওদের মাথা দারুণ খেলত। ওদের ভয়ে অনেকেই সন্ত্রস্ত থাকত। এই অভিজিৎরাই আবার সামাজিক কর্তব্যে ছিল অগ্রণী। বিয়েতে খাটা, শ্মশানবন্ধু হওয়া ইত্যাদিতে এদেরই ডাক পড়ত। এই

হস্টেলেই আসর জমাতো আরও অনেকে—বিক্রম নায়ার, নিবারণ চৌধুরী, দয়াভাই ভক্ত (পরে নাম করা চিত্রপরিচালক) জগন্নাথ পাণ্ডে, প্রীতিশ দাস। ওদিকে কলাভবনেও একালের নামজাদা অনেকে তখন ছাত্র! শোভন সোম সুরেন দে রবীন্দ্র পাল জ্যোৎস্না দত্ত সন্দীপ ঠাকুর দিলীপ চৌধুরী শুভচারী দাশগুপ্ত প্রণব দেববর্মা ওবায়দুর সিং কাঞ্চন চক্রবর্তী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরাও ছিল আড্ডাবাজ। ওদের দিয়েই ১৯৫৩ সালে করাই তেপান্তরের মাঠে। সুর দেয় দিলীপ চৌধুরী ও সন্দীপ ঠাকুর—পাথুরেঘাটার প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের ছেলে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নামী শিল্পী, আগেও এবং হরিপ্রসাদ মোদক, ছিল ফুটবলে দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার।

নতুন বিভাগ হিসেবে বিদ্যাভবন তখন জমতে শুরু করেছে। ভূপ্ নান্দা কাণ্ড করে তখনও ছাত্র। ভর্তি হয়েছে এম.এ ক্লাসে। অনাদিও তাই। বিশ্বজিৎ সঙ্গীতভবন থেকে পাশ করে চাকরি নিয়েছে শ্রীনিকেতনে। ডঃ বাগচি অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। আসতে লাগলেন নতুন নতুন অধ্যাপক—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন বসু মধুসূদন মল্লিক সুনীতি পাঠক সন্তোষ বসু এবং আরও অনেকে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী স্বামী শঙ্করানন্দ আসেন চীন ভবনে গবেষণা করতে। তিনি দাবি করেন, মহেঞ্জো-দারো লিপি পড়তে পেরেছেন। পরে ছাপা হয় তাঁর বিখ্যাত ও বিতর্কিত বই—ইণ্ডাজ ভ্যালি স্পীকস।

হঠাৎ রথীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করে চলে গেলেন দেরাদুনে। ক্ষিতিমোহন সেন হলেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য। তারপর পাকাপাকি-ভাবে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি। ডঃ বাগচি আমাকে তাঁর অধীনে গবেষণার কাজে লাগালেন। মহাভারত নিয়ে। আমার পছন্দ হল না। তারপর দিলেন তাঁরই সংগ্রহ পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত সম্পাদনার ভার। বিশ্বভারতী থেকে গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে বইটি পরে

বেরিয়েছে। কিছুদিন পর হলাম বাংলা পুঁথিশালার অধ্যক্ষ। পুঁথি সংগ্রহ করতে বীরভূম বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি সাইকেলে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কুড়মিঠা গ্রামে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে থেকে গরুর গাড়িতে দুজনে চড়ে পুঁথির খোঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম। বীরভূমের গ্রাম আমি প্রথম ভাল করে দেখি অনিলদার নির্বাচনী প্রচারের সময়ে। তারপর পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রাম আরও দেখা হয় ঠিক ওই সময়ই বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ কুলদা চৌধুরী মশাই যখন আমাকে ভার দিলেন সমাজ শিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে নাটক করানোর। হ্যাজাক, লণ্ঠন আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে দল বেঁধে ঘুরতাম এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে, করাতাম শিক্ষামূলক নাটক। বেশিরভাগ রাতে অভিনয় হত গ্রহনক্ষত্র নিয়ে আমারই লেখা শিক্ষামূলক নাটক 'সৌরজগৎ'।

জীবন যখন চলছে এবং পুরানো ও নতুন বন্ধুদের নিয়ে যখন সুখ-সাগরে সাঁতরে ভাসছি, তখন ডঃ বাগচি আমাকে পাকা চাকরি দিলেন কলেজে পড়াবার। আমাকে তখন আর পায় কে! পুচ্ছ তুলে উচ্ছল নাচার অবস্থা। বাংলা বিভাগের প্রধান তখন প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি আমাকে ডেকে আশীর্বাদ করলেন, বলে দিলেন কোন ক্লাসে কী পড়াতে হবে।

এদিকে শান্তিনিকেতন তখন গায়ে গতরে বাড়তে শুরু করেছে। গুরুদের বাড়ির পাশে হয়েছে বিদ্যাভবনের ছাত্রদের নতুন হস্টেল। আমি শিক্ষাভবন হস্টেল ছেড়ে ওয়ার্ডেন হয়ে চলে গেলাম ওখানে। চারদিকে উঠতে লাগল বাড়ি। মাঝখানের আশ্রম এলাকা ঠিকই আছে কিন্তু পূর্বপল্লী মাঠ ছেয়ে যেতে লাগল বাড়িতে, বুঁজে যেতে লাগল খোয়াই। হল রতনপল্লী, হল সেবাপল্লী। গুরুপল্লীর মাঠ বাড়ি হয়েছে। ছাত্রের সংখ্যা বাড়ল। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ল। উত্তরায়ণের বাড়িতে উপাচার্য ও কর্মসচিবের অফিস। তখন কর্মসচিব নিশিকান্ত সেন। আমাদের আশ্রম ধীরে ধীরে হয়ে গেল ইউনিভার্সিটি।

১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ করেছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে বানান শান্তিনিকেতন বাড়ি ও মন্দির। জায়গাটা হয় ব্রহ্মোপাসকদের তীর্থস্থান। বলেন্দ্রনাথ এখানেই স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী এবং ১৯৫১তে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এককালে ছিল যেন কালাহারি মরুভূমি। চারদিকে অনন্ত দিগন্ত। শুধু কিছু তাল আর খেজুর গাছ। চেঁছেমুছে সেই মরুভূমি হয়ে গেল পুষ্পোদ্যান। খোয়াইকে ঢাকল গাছপালা, বাড়ি। বিশ্ববিদ্যালয় তীর্থপ্রাঙ্গণ বিশ্বভারতী তত্রাদনে অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে সুখের মুখ দেখতে চাইল। কিন্তু সুখ সে পেল কিনা জানিনা, টাকা তার স্বস্তি কেড়ে নিল।

তবে সেই সময় অনেক বিদেশী ছাত্র ও অধ্যাপকে আশ্রম ভরে উঠেছিল। প্রথমেই সে সময়কার যে ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তাতে দেখছি রতনকুঠি থেকে সেই সাত সকালে সাইকেল চালিয়ে মার্কিন মুলুকের জন বেরী চলেছে আশ্রমের দিকে তার মুখে গুনগুন একটি গানের কলি—একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। চীনভবন থেকে মুকুট ঘরের পাশ দিয়ে পুরানো ঘণ্টাতলার গা ঘেঁসে শান্তিনিকেতন বাড়ির দিকে চলছেন বৃদ্ধ অধ্যাপক ডঃ ভালটার লীবেনথাল। এই জর্মন মনস্বী কুড়ি বছর চীনে কাটানোর পর সস্ত্রীক ঠাঁই নিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। তিনি ডান কানে শুনতেন না, বাঁ কানে শুনতেন। এটা জানা না থাকলে কথা বলার সময় বিপদ হত। কেউ কথা বলতে এলে তিনি সব সময় ডানদিকে সরে যেতে চাইতেন যাতে বাঁ কান আলাপীর মুখের দিকে থাকে। অচেনা লোক তাতে অবাক হত, তাঁকে ছিটগ্রস্ত ভাবত। সদা শেখা জর্মনে আমরা তাঁকে বলতাম গুটেন মর্গেন। বাঁ কান হলে জবাব পেতাম, ডান কান হলে নয়।

তেমনি সবাই ছিটগ্রস্ত ভাবত সানফ্রান্সিসকোর বিল মলকে।

টকটকে লাল চেহারা, পাজামা, পাঞ্জাবি, খালি পায়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত এদিক-ওদিক। আজ নেপাল, কাল ডালটনগঞ্জ। ছুটি পেলেই ছুটোছুটি। ছুটি না পেলে ক্লাস কামাই। দূরে না হলে কাছেপিঠের গ্রামে তাঁকে দেখা যেত নানা সময়ে। আমার সঙ্গে একবার গিয়েছিল শিলং। আমার মধ্যবিত্ত কাকার বাড়িতে রাঙ্গামুখো এক সাহেব কাঁঠালের কোয়া মুখে পুরছে দেখে কেউ ভাবল শ্বেতী রোগী, কেউ ভাবল সি আই এর দালাল, কেউ ভাবল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উন্মাদ। কেননা একজন আমেরিকান সাহেব এক ছাপোষা বাঙ্গালীর বাড়িতে উবু হয়ে বসে কাঁঠাল খাচ্ছে—এমন দৃশ্য কল্পনারও বাইরে।

বিল স্মলের উল্টো ছিলেন জার্মান গবেষক ডঃ ভিলহেলম রাউ। এখন মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি কদাচিৎ শান্তিনিকেতন থেকে নড়তেন। ছুটিছাটা হলেও হয় লাইব্রেরি না হয় নিজের ঘর। তিনি আমাদের জর্মনও পড়াতেন। ভারততত্ত্ব ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলতেন, তারিখের হিসাব বি-সি হলে জবাব দিতে পারব, এ-ডির কোন খবর আমি রাখি না। যত প্রাচীন বিষয়, ততই তাঁর আগ্রহ। এই প্রাচীনত্বের টানেই তিনি ভারততত্ত্বে আকৃষ্ট হন। জুরিখের সুইস জর্মান ডঃ পল হোর্শও ছিলেন একই পথের পথিক। তিনি খুব মিশুকে ছিলেন। আমি তাঁকে বাংলা পড়াতাম। ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ছেলেবেলা তিনি চমৎকার পড়তে পারতেন। বেচারা ডঃ হোর্শ বছর কয়েক আগে ভারতে বেড়াতে এসে মহাবলীপুরমের সমুদ্রে ডুবে মারা যান।

রতনকুটির দু'পাশে দুটি বাড়ি তৈরী হয়েছিল—স্কলার্স ব্লক। ওখানেই থাকতেন বেশির ভাগ বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী। স্কলার্স ব্লকে থাকত অংকারার রাশি গোভেন, রেঙ্গুনের মাউ তিন, আলেকজান্দ্রিয়ার আইজ্জত এবং আরো অনেকে। আইজ্জত ছিল নারীমনঘাতী দুর্দান্ত সুপুরুষ। গোবেচারী গোভেন তার ভাঙ্গা ইংরেজি আর গালভরা দাড়ি নিয়ে পাত্তাই পেত না। তার মনে এজন্যে দুঃখেরও অবধি

ছিল না। তবে এই গোভেন শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গিয়েছিল যে, আশ্রম ছাড়ার সময় বোলপুর স্টেশনে হাউহাউ করে কেঁদেছিল। এখনও তার কান্নায় ভেজা ফোলাফোলা চোখ চোখের সামনে ভাসে। আমরা দল বেঁধে তাকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম।

তবে কান্নার ব্যাপারে টেক্কা দিয়েছিল বাগদাদের সামিরা এল নাসির। আমরা ডাকতাম সমীরা বলে। গোদাগোদা পা, হাসি হাসি মুখ। কলাভবনে ক্রাফ্‌ট শিখত। ভীষণ মিশুকে ছিল। আমাদের সঙ্গে আড্ডা মারত আকছার। বছর তিন পর যখন দেশে ফেরার সময় হল, সামিরা বেঁকে বসল, যাবে না। কিন্তু যেতেই হল এবং চোখের জলে সারা শান্তিনিকেতন ভাসাল। সামিরা এখনও তার বন্ধুবান্ধবদের চিঠি দেয়, স্বামী-পুত্র-কন্যার ছবি পাঠায়।

মার্কিন দূত চেস্টার বোলজের মেয়ে সিনথিয়াও ছিল ছাত্রী। অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের পোশাক ছিল পাজামা, পাঞ্জাবি; ছাত্রীদের নিজ নিজ স্বদেশী পোশাক, কিন্তু সিনথিয়া পরত সালোয়ার পাঞ্জাবি দোপাট্টা। চমৎকার বাংলা শিখছিল ও। হাতের লেখা ছিল মুক্তোর সারি। শান্তিনিকেতন নিয়ে একখানা সুন্দর বই পরে লিখেছে সিনথিয়া, বলেছে ভারত তার দ্বিতীয় জন্মভূমি। সিনথিয়ার মতই মিশে গিয়েছিল এডনা ইভান্স, লিলিয়ান, রোশেনারা, লিলি মি, লুসি মি প্রভৃতি ছাত্রীরা। এডনা নাচ শিখত, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে একবার নেমেছিল মদনের ভূমিকায়।

লুসি মি, লিলি মি— এই দুই বোনের কথায় মনে পড়ছে আমাদের শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা চীনা অধ্যাপক তান সাহেবের দুই মেয়ের কথা। তান ওয়ান ও তান চামেলি একেবারে বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছে। তান ওয়ান তো এখন দিল্লিতে বাংলারই অধ্যাপিকা। শান্তিনিকেতনে যাঁরা তখন বিদেশ থেকে বা অন্য রাজ্য থেকে আসতেন, প্রত্যেকেই বাংলা শিখতেন। কালোর দোকানে দেখেছি পাঞ্জাবের রাণা, গুজরাটের

ধীকভাই এবং কেরলের বিক্রম নায়ার বাংলাতেই আড্ডা মারছে। জাপানী অধ্যাপক কাসুগাইয়ের ছেলেমেয়েরা সুন্দর রচনা লিখত বাংলায়। [illegible] তিব্বতী অধ্যাপক লামাজির ছেলে-মেয়েরা চেহারায় না হোক, চালচলনে কথাবার্তায় খাঁটি বাঙ্গালী। একটি জর্মান ছেলে হের [illegible] হাঁটু মুড়ে বসে পাতা পেতে খিচুড়ি পর্যন্ত খেত।

বাংলা শিখতে সবচেয়ে অসুবিধে হত আফ্রিকার ছেলেদের। ঘানার কুমার আর কেনিয়ার ওকেলো কিছুতেই আমাদের ভাষা রপ্ত করতে পারেনি। দুর্দান্ত ফুটবল খেলত, চমৎকার গান গাইত, পড়ত ইকনমিকস ওকেলো। খেলার মাঠে নামলেই আমরা চেঁচাতাম 'ও-লো-লো ও-কেলো!' ওকেলো পরে তার মানে জানতে চাইলে [illegible] বোঝাতে [illegible] ওকেলোর ছিল দশাসই চেহারা। কাঁঠালের গায়ের মত মাথার চুল। একবার কোন একটা উৎসবে আমার এক বন্ধু শান্তিনিকেতন এসেছিল মাঝ-রাত্তিরের ট্রেনে। তখন মধ্য রাতে [illegible] হত। আমি তখনও কলেজ হস্টেলে। আমার [illegible] চন্দ্র, সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও ওকেলো। বন্ধুটি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে ঢুকে আমার পাশেই শুয়ে পড়ে। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ভয় পেয়ে আমাকে ঘুমের মধ্যে ঠেলা দিয়ে জানতে চাইল কিসের ডাক। আমি ঘুমের ঘোরেই জবাব দিলুম, 'বাঘের।' খানিক বাদেই আবার বন্ধুর [illegible] দূর থেকে আবার যেন কিসের ডাক। বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে আমি বলি, না ও কিছু নয়, ভালুক-টালুক হবে বোধহয়। রাতের অন্ধকারে বন্ধুর মুখের চেহারা কেমন হয়েছিল আন্দাজ করতে পারিনি, তবে আমি মিথ্যে বলিনি। তখন শান্তিনিকেতনের গায়ে ভুবনডাঙ্গায় ছোট একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল। তাদেরই খাঁচার বাঘ ভালুক রাত্তিরবেলা ডাকত। সার্কাসের কথা বাদ দিয়ে বন্ধুকে আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম এবং ভাবতেই পারিনি, কিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া তার মনে হতে পারে। তার সেই প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন। সে ভেবেছিল—পাখির ডাক, হরিণের ছুটোছুটি আর

মেয়েদের মুচকি হাসিতে শান্তিনিকেতন একেবারে কণ্ব মুনির আশ্রম। তার বদলে কিনা অন্ধকার রাত্রে বাঘের হুংকার, ভালুকের চিৎকার। সে বাকি রাত ভয়ে ভয়ে বসেই কাটাল।

ভোরবেলা ঘুমটা যখন জমে উঠেছে, তখন আবার বন্ধুর চিৎকার। আমিও উঠে পড়ি। বন্ধু ফিসফিস করে ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করল—ওটা কী? আমি বললাম—কী নয়, কে। জাসটিন ইয়ানুমা ওকেলো। কেনিয়ার মানুষ থেকো। বলেই ঘুমিয়ে পড়লাম আবার। খানিক বাদে ঘুম থেকে উঠে দেখি বন্ধুটি মালপত্র সমেত হাওয়া। দিন দুই পরে চিঠি—'আর কখনও শান্তিনিকেতনে আসব না।' ব্যাপারটা বুঝলাম। রাত্রে বাঘ ভালুকের ডাক শুনে বন্ধুটি ভয় পায়। তারপর ঘুম থেকে উঠে দেখে দীর্ঘদেহী কৃষ্ণকায় নিগ্রো ওকেলো জাঙ্গিয়া মাত্র পরে লম্বা দাঁড়িয়ে শরীর বেঁকিয়ে হাত শূন্যে তুলে হাই তুলছে। ওই চেহারা দেখেই তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পরে ওকেলোকে গল্পটা করেছিলাম। ও হেসে কুটিকুটি। সেই ওকেলো এখন কেনিয়ার ফিনান্স মিনিস্টার, না কী যেন!

দীপচাঁদ বিহারী গুপ্ত ছিল মরিশাসের লোক। মূলে ভারতীয়। বিহার ছিল আদিনিবাস। গিরমিটিয়া চিনি-কুলি হিসাবে ও দেশে গিয়েছিলেন ওর পূর্বপুরুষ। মাণরাম অঙ্গানুও ছিল ওই রকম ফিজির লোক। দীপচাঁদ নিজেকে পরিচয় দিত কলকাতাইয়া বলে। কারণ কলকাতা বন্দর থেকে তার ঠাকুরদার বাবা সেই দ্বীপে গিয়েছিলেন। দীপচাঁদ খুব সাজেগুজে থাকত। চুলের পরিচর্যায় রোজ সময় নিত ঘণ্টা দুই। সখ ছিল বম্বেতে গিয়ে সিনেমা নামার। পড়াশোনায় তার একদম মন ছিল না। তার গবেষণার ধরনও ছিল অদ্ভুত। বিষয়—শরৎ সাহিত্য। বাংলা পড়তে পারে না, বাংলা ও হিন্দীতে পড়ে শরৎবাবুর সব উপন্যাস। পরীক্ষায় উত্তর লেখে ইংরেজিতে এবং ইংরেজিতেই এম.এ পাশ করে। বাংলা বই, হিন্দীতে পড়াশোনা এবং ইংরেজিতে উত্তর। আমি তখন তাকে বলেছিলাম,

ভাই তোমার ডিগ্রিটা যদি ফরাসীতে এম. এ হত, তাহলে কিন্তু আরো চমৎকার হতো। দীপচাঁদের ইচ্ছে ছিল না ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার। ও বলত, আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। দেশটা এত ছোট যে. প্রত্যেক লোককে আমি চিনি।

ইডা বাগুস মন্ত্র ছিল বিদেশী হিন্দু; বালিদ্বীপের লোক। সুন্দর সুগঠিত দেহ। আই. এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ডক্টরেট হয়ে বেরিয়ে যায়। এখন সে ইন্দোনেশিয়া সরকারের সংস্কৃত দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল। মন্ত্রের কাছে আমি কিছু দিন ইন্দোনেশিয়ার ভাষা শিখেছিলাম। বাটার সিসটেমে আমি ওকে বাংলা শেখাতাম। শিখেছিলাম একটি ইন্দোনেশীয় ধাঁধা। সেই ধাঁধাটি আর এক ইন্দোনেশীয় গবেষক ডঃ সুদীপ্তকে, সুগত-মালুর বাবা, সুকুমার বসুর বাড়িতে বলে চমকে দিয়েছিলাম—'পাগি পাগি বারকাকি এমপাট্, টেংগা হারি বারকাকি দুয়া, পেটাং পেটাং বারকাকি টিগা। সিয়াপাকা ইতু?'—অর্থাৎ কিনা, ভোরবেলাতে চার পা তার, দুপুরবেলায় দুই, সন্ধ্যে হলে তিন পা হল, বল্ দেখি কে তুই? উত্তরটি হচ্ছে 'মানুষ'। ইন্দোনেশীয় ভাষায় 'মনুষ্য'। মন্ত্রের কাছ থেকে জানতে পারি ওদের ভাষা সংস্কৃত শব্দে ভরা। পুস্তক কুসুম বণিতা বাহিত্র প্রধানমন্ত্রী বার্তা ইত্যাদি শব্দ তারা অনর্গল ব্যবহার করে। মন্ত্র একটা শব্দ যখন-তখন ব্যবহার করত—'আ-ডু।' আমরা বুঝতে পারতাম না, তার মানে কী? একবার ক্রিকেট খেলায় একটা বল তার নাকে লাগার সময় মন্ত্র বলে উঠল—'আ-ডু', আমরা বুঝলাম আ-ডুর বাংলা নিশ্চয়ই 'ওরে বাবা'।

বিদ্যাভবন আগে ছিল শুধু গবেষণা বিভাগ। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাওয়ার পর এম. এ ক্লাস তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে প্রতি বছর হয় ফুটবল লীগ। ১৯৫১ সালে বিদ্যাভবন সর্বপ্রথম ফুটবল লীগে নাম দেয়। কিন্তু দু-একজন ছাড়া কেউই ফুটবল খেলা জানত না। তবু বিদ্যাভবনের প্রিন্সিপাল ডঃ প্রবোধ

বাগচির উদ্যোগে এবং ভাইস প্রিন্সিপাল ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের জবরদস্তিতে বিদ্যাভবন আনকোরা আনাড়িদের নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। মন্ত্র যেহেতু ক্রিকেটে উইকেটকীপার, তাকে নামানো হল গোলে। বিল স্মল, জন বেরী, দীপচাঁদদের নিয়ে আমরা তো মাঠে নেমে পড়লাম। এখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারাপদ মুখার্জি, শুভময়, অনীশ, প্রভাত ভঞ্জ, আমি, ডঃ ভট্টাচার্য, অমিয় সেন প্রমুখ সবাই। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রতিপক্ষ কলাভবন। বিশালকায় ডঃ ভট্টাচার্য আণ্ডারওয়ার পরে ব্যাকে দাঁড়িয়ে। ধুতি মালকোঁচা মেরে আমি রাইট আউট। একই পোশাকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড অমিয়দা, গোলে হাঁটু ঠক ঠক মন্ত্র। অন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলা তো শুরু হল। বিল স্মল জানত না, ওই গোলাকার চামড়ার বলটা নিয়ে খেলোয়াড়দের কী করা উচিত। সে একবার এদিকে দাঁড়ায়, আর একবার অন্য দিকে। এমন কি বলটা তার পায়ের কাছে এলেও বলকে না মেরে তার পাশাপাশি ছুটতে থাকে ইতিমধ্যে কলাভবনের শিল্পী-খেলোয়াড় সুরেন দে বুট দিয়ে এমন জোরে মারল যে খালি পদ তারাপদ তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী। নেংচাতে নেংচাতে সে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। আমাদের এলোপাথারি ছুটাছুটিতে কলাভবনের দলও গোড়ায় দিশেহারা, কিন্তু খানিক বাদেই গোলের পর গোল। একটা গোল হয় এবং মন্ত্র চিৎকার পাড়ে—দু-দু। ইতিমধ্যে এক অঘটন। ডঃ ভট্টাচার্যের লম্বা শটে একটা বল গিয়ে পড়েছিল কলাভবনের গোলের কাছাকাছি। দীপচাঁদ ছিল পেছনেই। তার পিছনে সুরেন দে। সুরেন দের বুটের ভয়ে সে মাঠ ছেড়ে পালাতে এমন দৌড় লাগাল যে, পায়ের কাছে পড়ে থাকা বলটা দীপচাঁদের পায়ে লেগে দীপচাঁদ সমেত প্রবল বেগে ঢুকে পড়ল গোলে। প্রাণভয়ে ভীত দীপচাঁদ হস্টেলের দিকে আরো ছুটতে গিয়ে আটকা পড়ল গোলের নেটে। ওদিকে 'গোল গোল' বলে বিদ্যাভবনের সমর্থকদের দারুণ উল্লাস। দীপচাঁদ কিছুই বুঝতে

পারেনি। চিৎকার চেঁচামেচিতে সে ভাবল, বোধহয় আবার কোন গণ্ডগোল করে ফেলেছে। সে নেটের বাঁধন থেকে বেরিয়ে সোজা দৌড়ে পালাল হস্টেলে। এই রকম আরো অনেক ঘটনার পর দেখা গেল রেজাল্ট। ৯-১ গোলে বিদ্যাভবন পরাজিত এব আমাদের এগারোজন খেলোয়াড়দের কেউ হাসপাতালে, কেউ জ্বরে শয্যাশায়ী, কেউ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তারাপদ তো খোঁড়া পায়ে চিরজীবন কলাভবন বিদ্বেষীই হয়ে গেল। এখন তার বনবাস লণ্ডনে।

অনেক বিদেশী সস্ত্রীক থাকতেন শান্তিনিকেতনে। যেমন রবীন্দ্র সাহিত্য শিক্ষার্থী স্টিফেন হে, ইংরেজির প্রধান রয় নর্থ ক রেক্‌টন গুডরিচ, ইরানের কং আজম। এঁরা সকলেই আমার বাংলা শেখার ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। কম্বোডিয়ার বৌদ্ধভিক্ষু ফনস্কান এবং তাইল্যাণ্ডের ভিক্ষু ক্ষেমশ্রী বাংলা শেখার চেষ্টাই করেন নি

বিদেশীদের সঙ্গে এদেশী লোকেদের মেলামেশা ছিল খুব। আলাদা বিশেষ খাতির কিংবা অপরিচয়ের দূরত্ব—কোনটাই ছিল না। অন্য পাঁচজনেরই একজন ছিল তারা। দু-একজন বাদে সবাই খাওয়া দাওয়াও করত অন্যদের সঙ্গে কিচেনে। ফলে ওদের সকলের সঙ্গে আমরা সবাই এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম, ওরা যে বিদেশী ওরা যে দু'দিনের অতিথি—একথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম কোন অনুষ্ঠানের শেষে কিংবা দলবেঁধে বেড়িয়ে বাইরে থেকে ফেরার সময় ভুবনডাঙার কাছাকাছি যখন সবাই গান ধরত 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' তখন সহযাত্রী বিদেশী বন্ধুরাও গলা মেলাতো, বলতো 'আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে, মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা, যে তার সুরে' এতদিন পর এখনও সেই গানের সুর আমার কানে বাজে, ভেসে ওঠে কতকগুলি বিদেশী ফুলের মুখ। আমাদের শেফালি পলাশ বকুল পারুলের সঙ্গে যারা মিশে গিয়েছিল। বিল স্মল, তুমি এখন কোথায়? সামিরা তুমি কেমন আছ?

৮

ছিলাম সুখেই, নিশ্চিন্ত আরামে। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা। তাছাড়া অন্য কাজকর্ম। চোখের সামনে শান্তিনিকেতন বদলাচ্ছে, কিন্তু আমরা যেন বদলাচ্ছি না। শুভময়ও চাকরি নিল বিদ্যাভবনে। বিশ্বজিৎ শ্রীনিকেতনে। মণ্টু রায়দা লাইব্রেরিতে। মণ্টু ঘোষদা আছেন ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে। কাজকর্মের ফাঁকে আড্ডা চলছে অবিরাম। কোআপ আর কালোর দোকানে আমরা ভিড় জমাই। ভকতভাই কালোর দোকানের পাশে বড় দোকান দিয়েছে। খুলেছে সেলুন। ভিতরের রাস্তাগুলোতে পড়েছে পিচ। বড় বড় বাস, নতুন নতুন রিক্শা, ট্যাক্সিতে সরগরম।

এই সময়ই মাথায় এল একটা ভাল কাগজ বের করার। ভুলুই বেশি উৎসাহী। আমি সম্পাদক, ভুলু প্রকাশক, বিশ্বজিৎ পরিচালক। আমাদের সহকারী পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ণানন্দর ডাক নাম লেবু। তার অন্য ভাই বোনেদের ডাক নাম হল, কপি আলু কচি। তাই পূর্ণানন্দর মাকে অনেকে বলতেন 'তরকারির মা।' পূর্ণানন্দ এখন রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রজীবন নাড়া চাড়া করে খ্যাতি পেয়েছে। আলু অর্থাৎ দেবী চট্টোপাধ্যায় উদ্যানবিদ, উত্তরায়ণের পরিচর্যায় রয়েছে ভারপ্রাপ্ত হয়ে। অশোকবিজয়দা নাম দিলেন 'ঋতুপত্র'। পুরো এক বছরে ছটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। ভাল চলছিল। ভাল ভাল প্রবন্ধ সব বেরিয়েছে। তাছাড়া বেরিয়েছে 'গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকৃত সুরের স্বরলিপি। পুলিনদা—পুলিনবিহারী সেন—বলতেন "ছোট বিশ্বভারতী পত্রিকা।" রবীন্দ্রসদনে 'মুসলমানীর গল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত রচনা দেখতে পেয়ে আমরা ঋতুপত্রে ছাপিয়ে দিই। কয়েকদিন বাদে ডঃ বাগচি আমাদের ডেকে

পাঠালেন, বললেন, "এই দেখ, রথীবাবুর চিঠি। দেরাদুন থেকে লিখেছেন। তাঁর অনুমতি না নিয়ে গল্পটি ছাপলে কেন?" আমরা লজ্জায় পড়ে গেলাম। ডঃ বাগচি বললেন, "তোমরা ওঁর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও।" আমি সেদিনই রথীন্দ্রনাথকে সম্পাদক হিসাবে চিঠি লিখলাম, "রচনাটির জন্য উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা দিতে আমরা প্রস্তুত।" রথীদা নাকি আমার সেই চিঠি পড়ে হেসেছিলেন।

কে এম পানিকর সমাবর্তন ভাষণ দিতে আসেন পঞ্চান্ন সালে। সেই বিবরণটা একটু বিস্তারিত দিতে চাই—এই পানিকরই আমার পেশা পাল্টে দিলেন। একদিন আমাদের আসর ভাঙল। ঋতুপত্র বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে মারা গেলেন ডঃ বাগচি। ডঃ বাগচি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। লেখাপড়া আর প্রশাসনিক কাজের চাপ তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়। তার উপর একমাত্র পুত্রের বালক বয়সে মৃত্যু তাঁর শেষ দিন দ্রুত ঘনিয়ে আনে। বাইরে বোঝা যেত না। কিন্তু ভেতরে বুক ভাঙ'ছল। সকালে পুত্রের শ্রাদ্ধ সেরেই এসেছেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। কিছু বোঝা যায় নি। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই মৃত্যু এল। আমি ১৯৫৬ সালের পয়লা মার্চ হঠাৎ শান্তিনিকেতন ছাড়লাম আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের চাকরি পেয়ে। 'পৌষ উৎসবে পানিকর' নামে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি লেখা অশোককুমার সরকারের ভাল লাগে। তিনি আমাকে ডেকে নেন। ভুলুও মস্কোতে চাকরি পেয়ে চলে গেল। ভুলুর পিছন পিছন মস্কো গেল বিশ্বজিৎ। সরকারীভাবে শান্তিনিকেতন ছাড়লাম, কর্মক্ষেত্র পাল্টালাম, কিন্তু শান্তিনিকেতন তো জড়িয়ে আছে মনে, ছড়িয়ে আছে পঞ্চেন্দ্রিয়ে। আমি ততদিনে অন্য মানুষ। গান শোনার কান তৈরি হয়েছে, ছবি দেখার চোখ তৈরি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে জেনেছি গভীরভাবে, হিন্দু-মুসলমান-বাঙালী-ওড়িয়ার বিভেদ বুঝিনা, বড়বাবু বেয়ারায় তফাৎ

জানিনা, ফুল ভালবাসি, ভালবাসি প্রকৃতিকে, সর্বোপরি আনন্দ সর্বকাজে। কান ও চোখ তৈরি হয়েছে বলাটা ঠিক নয়, ওই রসে মন আকৃষ্ট হয়েছে বলতে পারি।

পানিকর যেবার দীক্ষান্ত-ভাষণ দেন, সেবারের পৌষমেলায় আসি। পানিকর যতটা, তার চেয়ে বেশি পরিচয় মিলবে মেলার। সাতই পৌষ বিকেল চারটে নাগাদ মেলার মাঠের বটগাছটার পাশে চৌবাচ্চার উপর পা ছড়িয়ে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম আমি আর শুভময় ঘোষ। হঠাৎ দেখি একটি চেনা মুখ মেলায় ঢুকলো। পরনে ধূসর রঙের প্যাণ্ট, গলাবন্ধ কোট, হাতে লাঠি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। ব্যাকব্রাশ করা পাতলা কাঁচাপাকা চুল, আর চিবুকে সুপরিচিত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সমস্ত চোখেমুখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। বয়স ষাটের কোঠায়। চিনলুম ইনিই সর্দার পানিকর, সঙ্গে সেক্রেটারী। আলাপ করার বাসনা নিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। বললুম —'আলাপ করতে চাই।' নমস্কার বিনিময়ের পর লাঠিতে ভর করে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি করো এখানে?"

শুভময়কে চোখ টিপে উত্তর দিলুম—"ছাত্র, এখানে পড়ি।"

"কোন্ ডিপার্টমেণ্ট।"

"ডিগ্রী কলেজ বিদ্যাভবন"—

"কোন্ ইয়ার"—

এই রে এবার কি বলি। জবাব দিতে দেরী দেখে আবার জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ ইয়ার?" আর পালাবার পথ নেই। শেষমেষ মরিয়া হয়ে বলি—'মাফ করবেন; সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা বর্তমানে ছাত্র নই। চাকরি করি—এখানকার কলেজে পড়াই। এখানে ছাত্র ছিলুম বছর কয়েক আগে। আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে কলেজের ছাত্র হিসেবে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালালে আপনি ভাববেন, বাঃ বেশ অনেককিছু জানে তো ছেলেটা, আর ঐ বিদ্যেবুদ্ধি মূলধন করে মাস্টার হিসেবে নিজেকে চালালে বলতে পারেন—উঁহু, নট

আপটু এক্সপেকটশনস্। তাই কি করি, মাস্টারের চেয়ে ছাত্র হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

হো হো করে হেসে ওঠেন পানিকর। লাঠিটা মাটিতে দুবার ঠুকে বললেন—"বেশ চালাক ছেলে তো তোমরা। কোন সাবজেক্টে এম-এ ?"

"আজ্ঞে, দুজনেই বাঙলায়"—আমি সবিনয়ে জানাই।

"সত্যি বলছ তো ? ঠিক করে বল বাঙলা না ইতিহাস ?"

"কেন, কেন"—এবার আমাদের আশ্চর্য হবার পালা।

"কে জানে, আমি ইতিহাসের লোক আর বাঙলা জানি না বলে আসলটা চেপে যাচ্ছ। আমাকে দেখাতে চাও যেন ইতিহাসের ছাত্র না হয়েও ইতিহাসের কত কিছু জানো"—পানিকরের কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস।

"বিশ্বেস করুন, এটা কিন্তু সত্যি"—শুভময়ের ব্যাকুল উত্তর

"ঠিক আছে, এবার আমায় মেলা দেখিয়ে দাও। আমি হচ্ছি তোমাদের চীফ গেস্ট।"

"আপত্তি না থাকলে এর আগে এক কাপ চা খেলে হয় না ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না, আপত্তি কিসের। চল। আচ্ছা এখানকার সকলের হাতেই একটা করে ছড়ি দেখছি, ওগুলো কি শান্তিনিকেতনের সবাইকে রাখতে হয় ?" পানিকর জিজ্ঞেস করেন।

"ঠিক তা নয়। ওগুলো মেলাষ্টিক, পৌষমেলায় যারা আসে তারাই কেনে।"

"তাহলে তো আমাকেও একটা কিনতে হয়।"

"বেশ চলুন, কিনে দিচ্ছি"—

এক চক্কর মেলা ঘুরে আমরা এগোলাম চায়ের দোকানের দিকে। পথে সঙ্গ নিল জন ম্যামনা, ত্রিবাঙ্কুরের ছেলে—পানিকরের দেশের লোক।

দোকানে ঢুকছি। মনীষীদার সঙ্গে দেখা। শিল্পী মনীষী দে। পানিকরের অতি-পরিচিত। মনীষীদাকে দেখেই পানিকর উচ্ছ্বসিত হয়ে—"হ্যালো হ্যালো" বলে করমর্দন করলেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। মনীষীদাকেও চা খেতে ডাকলুম।

সবাই জড়ো হয়ে বসেছি। দোকানের একটি কোণায়। তখন বিকেল সাড়ে চারটা। সব দোকানেই ভীড়। মিহি, চড়া, মাঝারি নানা কণ্ঠের বিচিত্র কলরব। "ওহে আরো দু কাপ চা। কি মুশকিল ওমলেট দিতে এত দেরি কেন? না না, আমি কিচ্ছু খাব না। বাঃ রে, আমি যে ফিশ-ফ্রাই খাব বললুম। ও মশাই, এদিকে আসুন না, আমায় একটু এ্যাটেণ্ড করুন। আরে অসীর যে, আয় আয় বসে পড়। বলি খাওয়াচ্ছে কে?"—হরেক রকম আওয়াজে সারা দোকান গম গম করছে। তার সঙ্গে পেয়ালা-পিরিচের ঠুং-ঠাং, দু-একটা গানের কলি। পানিকরের মজা লাগছিল। বললেন—"চায়ের দোকানে যারা গোমরা মুখে বসে থাকে, তাদের আমি পছন্দ করি না। সবাই হৈ হৈ করবে, একজনের গলা ছাপিয়ে আরেকজনের গলা উঠবে।"

"আমরা তো তাই করি। আমাদের পছন্দ হওয়া উচিত।"

"তোমাদের ইতিমধ্যেই পছন্দ হয়ে গেছে। তার উপর আমাকে কফি খাওয়াচ্ছ। আচ্ছা, মনীষী দের সঙ্গে তোমাদের আলাপ আছে তো?"

গোল্ডফ্লেক টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে মনীষীদা বললেন—"আলাপ মানে, দারুণ ভাব।"

"এখন আসছেন কোত্থেকে"—মনীষীদাকে জিজ্ঞেস করেন পানিকর।

"আপাতত বাঙ্গালোর থেকে। আমি হচ্ছি ভবঘুরে লোক। আজ এখানে তো কাল ওখানে।"

"কিন্তু আপনাকে এত করে ঈজিপ্ট যেতে বললাম। গেলেন না কেন?"

"যাওয়া হয়ে উঠল না। কখন কোন্ জায়গা ভাল লেগে যায়, আটকা পড়ে যাই"—হেসে জবাব দেন মনীষী দে।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি, আর এটা-সেটা খুচরো আলাপ চলছে।

"আপনার এই কি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা?"—জন ম্যামন মুখ খোলে।

"হ্যাঁ, এই প্রথম। তবে আগে একবার আসার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। কাজের চাপে আসতে পারিনি"—কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিলেন পানিকর।

"কেমন লাগছে শান্তিনিকেতন?" শুভময় শুধায়।

"বেশ ভাল। শান্তিনিকেতনের প্রতি দেশের আস্থা আছে, শ্রদ্ধা আছে। তোমাদের কাছ থেকে দেশ অনেকখানি আশা করে"—

"শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসেবে আমরা গর্বিত"—বললে জন ম্যামন।

"তার সুযোগ নিতেও আমরা ছাড়ি না"—আমি যোগ করি।

"কি রকম?"

"বাইরের লোকেরা যে আমাদের প্রতি একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে তা আমরা জানি। তাই শান্তিনিকেতনের লোক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সবসময়ই সচেতন থাকতে হয়। আর বিপদে পড়লে তাকে কাজেও লাগাই। ধরুন—ট্রেনে ভীড়, জায়গা হচ্ছে না, লটবহর নিয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছি। গলা বাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের লোক বলে পরিচয় দিই। জায়গা হয়। টিকিটে ঢুকতে পাচ্ছি না—শান্তিনিকেতনের নাম বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গেই 'আসুন বসুন' দিয়ে শুরু হয় আপ্যায়নের ঘটা।"

"বেশ মজা তো। আমিও শান্তিনিকেতনের ছাত্র হলে পারতাম"।
—পানিকর বল্লেন।

আড্ডা জমে উঠেছে, কফির কাপও শেষ। আরেক কাপ অর্ডার

দেব কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখি দোকানের সামনে দিয়ে হন হন করে চলে যাচ্ছে তুটি মেয়ে। তুজনেই বিদেশী। হাত নেড়ে ওদের ডাকলুম। আলাপ করিয়ে দিলুম পানিকরের সঙ্গে।

"নাসেক মনস্থুরী ইজিপ্টের ছাত্রী; লুসী মী চীন দেশের। তুজনেই কলাভবনে ছবি আঁকা শিখছে।"

"হোয়াট এ কয়েনসিডেন্স। আমি তো ইজিপ্ট, চায়না তু-জায়গাতেই রাষ্ট্রদূত ছিলাম"—পানিকরের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর।

আরো তু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আমি বললুম—"সেই জন্যেই ওদের তুজনকে ডাকা, নইলে আমাদের আসরে অন্যদের ভাগ বসাতে দিতুম নাকি?"

লুসী মীর দিকে তাকিয়ে পানিকর বললেন—"তোমার বাড়ি চায়নার কোন্‌খানে?"

"কাংস্থু।"

"কাংস্থু? আমি গিয়েছি কাংস্থুতে খুব ভাল লেগেছিল। এখানে তোমাদের কেমন লাগছে?"

ভাঙা বাঙলায় তুজনেই একসঙ্গে বললে—"খু—ব—বা—লো।"

মনীষীদার দিকে তাকিয়ে পানিকর বলেন—"তোমাদের সঙ্গে এঁর আলাপ নেই? ইনি হচ্ছেন মিস্টার মনীষী দে, গ্রেট আর্টিস্ট।"

শুভময় বললে—"উত্তরায়ণে তাঁর ফ্রেস্‌কো দেখনি?"

মনীষীদা লাজুক হেসে বলেন—"ওগুলো ছেলেবেলার কাজ, তেমন ভাল নয়।"

"না না, আপনি যে এর চেয়ে ভাল ছবি আঁকেন, তা সবাই জানে। ইউ নো, আই লাইক মনীষী দে'জ ওয়ার্কস।"

"আমরা যাব আপনার ছবি দেখতে—" বললে নাসেক মনস্থুরী, আর লুসী মী।

"যেয়ো।" মনীষীদার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

শুভময় হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল একখানা বই

হাতে। গুরুদেবের লেখা ইতিহাসের বই—'A vision on Indian History' বইটি পানিকরের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে—"আজকের স্মৃতি হিসেবে এই বই আমরা আপনাকে উপহার দিতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়"—বইটা টেনে পাতা ওল্টান পানিকর। "আচ্ছা, এই বই কবে লেখা? পড়িনি আগে, ভাল করে পড়ে দেখতে হবে।"

"এটা একটা বাঙলা প্রবন্ধের অনুবাদ, সম্ভবত স্যার যদুনাথ সরকার করেছিলেন। আর লেখাও বোধ হয় এই শতাব্দীর একদম গোড়ার দিকে"—শুভময় বলল।

এক ফাঁকে নাসেককে বললুম—"জানো নাসেক, কলকাতায় তোমার আকা ছবি দেখে এলাম অল ইণ্ডিয়া আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস একজিবিশনে।"

টানা টানা চোখ দুটোকে আরো টেনে খুশীর সুরে নাসেক বলে ওঠে—"সত্যি? জানো, আমার দেখা হয়নি। আচ্ছা, ক'টা ছবি দিয়েছে আমার?"

"চারটে। লুসী মীর যে পোট্রেটটা করেছ, দারুণ হয়েছে।"

"পোট্রেট গ্যালারীতে সকলের সেরা"—শুভময় যোগ দেয়।

"না না, মোটেই ভাল হয়নি, আমার মত হয়নি। আমি কি ওরকম দেখতে"—লুসী মী চড়া গলায় আপত্তি তোলে।

"তুমি বললে কি হবে, ওটাই তোমার আসল চেহারা"—শুভময় ফোড়ন কাটে। কৃত্রিম কোপের ভাণ করে লুসী মী পানিকরকে সালিস মানে।

পানিকর জিজ্ঞেস করেন—"কি ব্যাপার?"

"এই নাসেক আমার মুখের একটি বিচ্ছিরি ছবি এঁকে কলকাতায় এক্সিবিট করেছে। আমি কি সত্যিই খারাপ দেখতে? আপনিই বলুন না"—লুসী মী অনুযোগ জানায়।

"কে বললে খারাপ দেখতে! তোমাকে তো আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে"—পানিকর বলে ওঠেন।

লুসী মী খুশী হল। বলল—"ধন্যবাদ, আপনাকে চীনে খাবার খাইয়ে দেব।"

চীনে খাবার? চীনে খাবারের কথা উঠতেই পানিকরের মুখে কথার তুবড়ি ছোটে। রন্ধন-বিজ্ঞান যেন তাঁর নখদর্পণে। একশ বছর আগেকার ডিমের কারি, অক্টোপাসের চাটান, পাখির বাসার ঝোল, হরেক রকম খাবারের ফিরিস্তি ছাড়লেন। আমাদের দৌড় চাঙ্গুয়া নয়তো ছাতাওয়ালা গলির চীনে দোকানের 'চাউ চাউ' নয়ত 'চিকেন চাউমিন'। লুসী মী আর পানিকর একজনের কথা আরেকজন লুফে নিয়ে রান্নার বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করলেন। মনীষাদা সমঝদারের মত মাথা নাড়েন। পানিকর বলেন—"সত্যি, রান্না জিনিসটা জানে চীনেরা। আমার মেয়ে কিছু শিখে এসেছে।" ওদিকে নাসেক মনসুরী গাল ফুলিয়ে বসে আছে।—"কেন, ইজিপ্টের রান্না আপনার ভাল লাগে না?"

"মোটেই না, ইজিপ্সিয়ানরা আবার রান্না করতে জানে নাকি?"

"বারে! খাননি 'বাসবুসা'?"

"খেয়েছি।"

"কোনাফা?"

"তাও খেয়েছি। আরে ও দুটোতো মিষ্টি। তার চেয়ে বাঙলা দেশের রসগোল্লা ঢের ভাল। কি বল তোমরা?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—আমাদের উল্লসিত কণ্ঠস্বর।

"আচ্ছা, মিষ্টি না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু 'শার্কাসাইয়া'—মাংসের রান্না, সেটা কি ভাল নয়?"

"ভাল, তবে তাও তো ঈজিপ্টের নিজের খাবার নয়, শিখেছে তুর্কীদের কাছ থেকে। ঈজিপ্টের ভাল যা খাবার আছে, সব নিয়েছে টার্কী বা আরব থেকে। নিজের খাবার ভাল কিচ্ছু নেই।"

মনীষাদা বললেন—"ভাগ্যিস যাইনি ঈজিপ্টে, গেলে তো না খেয়ে মারা পড়তাম।"

"নো নো, কারো কথা বিশ্বেস করবেন না, যাবেন আমাদের বাড়িতে, দারুণ খাবার খাইয়ে দেব"—নাসেক তবু হাল ছাড়ে না।

কথা প্রসঙ্গে চীনা শিল্পী জ্যুপেঁয়োর কথা উঠল। জ্যুপেঁয়ো শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর ঘোড়ার ছবির কথা কে না জানে। পানিকর বললেন—"জ্যুপেঁয়োর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল চীনে। অদ্ভুত তাঁর সৃজনী শক্তি। আর কি সরল অমায়িক ব্যবহার। আমাকে অনেকগুলো ছবি উপহার দিয়েছিলেন। চারটে ঘোড়ার, একটি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের ছবিটি নিজে রেখে বাকিগুলো ছেলে-মেয়েদের বিলিয়ে দিয়েছি। চীনা শিল্পকলা উঁচুদরের। চীনের নানা জায়গায় ঘুরে ছবি দেখেছি। চীনে যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম, অনেককে স্কলারশিপ দিয়েছি। চীন ও ভারতে শিল্পী বিনিময় হওয়া দরকার।"

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে যথাসম্ভব অনুনয় ঢেলে লুসী মাঁ বললে—"দিন না আমাকে একটা স্কলারশিপ, প্লীজ।"

"আর দেবার ক্ষমতা নেই, যখন রাষ্ট্রদূত ছিলাম তখন না হয় চেষ্টা করা যেত"—

"তাহলে আমাকে একটা দিন—অন্ততঃ আমার স্বামীকে, যাতে ইণ্ডিয়াতে এক্ষুনি চলে আসতে পারে"—বললে নাসেক। ঠিক বিয়ের পরদিনই নাসেক এখানে চলে আসে ছবি আঁকা শিখতে।

"একই ব্যাপার। আমার ঈজিপ্টের চাকরিও যে গেছে"—হেসে বললেন পানিকর।

আমি তক্ষুনি বললাম—"ঠিক আছে, এরপর যে দেশে আপনি রাষ্ট্রদূত হবেন সেখানকার একটা স্কলারশিপের জন্যে আমি আর্জি পেশ করে রাখলাম।"

"রাষ্ট্রদূত হওয়া তো আমার হাতে নয়। সুতরাং কোন আশা নেই"—পানিকর বললেন।

মনীষীদা বললেন—"বরং আরেক কাপ কফি খাওয়া যাক। অমিতাভ খাওয়াল, এবার আমি খাওয়াই।"

"নো নো, ওয়ান কাপ ইজ সাফিসিয়েন্ট।"

শুভময় বললে—"জানেন, সবাই বলছে আপনি নাকি ঠিক লেনিনের মত দেখতে।"

"That's what Bulganin said to me. কিন্তু আর তো দেরি করা নয়। সন্ধ্যে হয়ে এল, এবার উঠব।" পানিকর বুকপকেট থেকে ঘড়িটা টেনে সময় দেখেন।

"আবার কখন দেখা হবে"—ওঁর মুখে বলে ফেলি।

"কাল বিকেলে এখানে আসুন না"—শুভময় যোগ দেয়।

"কাল বিকেলে তো চলে যাচ্ছি রাজ্যপাল মিঃ মুখার্জির সঙ্গে। আর সকালবেলায় তো তোমাদের সমাবর্তন উৎসব। ঠিক আছে, সমাবর্তন উৎসবের পর"—

"কখন কখন ?"

"এই ধর, এগারোটা নাগাদ।"

"আসবেন তো ?"

"নিশ্চয়। আচ্ছা গুড্ বাই। কাল আবার দেখা হবে।"

পানিকর চলে গেলেন উত্তরায়ণে।

পরদিন ৮ই পৌষ। সকাল সাড়ে আটটায় আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন। প্রধান অতিথি পানিকরের ভাষণ গতানুগতিকতার বাঁধা সড়ক ছেড়ে নূতনত্বের আস্বাদ দিল। তাঁর স্পষ্ট ভাষণ নির্ভীকতার জন্যে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে খোলাখুলি মত দিয়েছেন। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজস্ব ক্ষমতার গুণে ভারতে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। আজ যদি কেউ আধ্যাত্মিক ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে তপোবনের আদর্শে বিশুদ্ধ ভারতীয় জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, তবে তা অর্থহীন হবে। বর্তমান ভারত আর অতীতের নিজস্ব চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী নয়। আজ ভারতে দেখা যাচ্ছে নূতন সভ্যতা, পুরাতন সভ্যতার কেবলমাত্র

ধারাবাহিকতা নয়। তাই যাঁরা ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন তাঁদের উচিত হবে নূতন সভ্যতাকে শক্তিশালী করা, যে সভ্যতা বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হল সাড়ে দশটায়। এগারোটায় পানিকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। বন্ধু-বান্ধবরা আড্ডা মারছিল চায়ের দোকানে। দলে ভিড়ে পড়লুম। ঠিক এগারোটা বাজতেই পানিকর হাজির। সঙ্গে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ ছ'ফুট সাড়ে ছ'ফুট পেশীবহুল চেহারা। আমরা কাছে গেলুম।

পানিকর বললেন—"এই যে এসেছ। কাল তো মেলা দেখা হয়নি। আজ মেলা দেখাও।"—

"বেশ চলুন।"

পানিকর আর মিঃ ব্যানার্জিকে নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এগোই। উত্তরের পীচ করা রাস্তা ঘেঁষে মিষ্টির দোকানের সারি, হরেক রকমের মিষ্টি থাকে থাকে সাজানো। অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, নেতাজী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই লাইন ধরে উত্তরায়ণের সীমানার সমান্তরাল ধরে রেস্তোরাঁর সারি। এখানেই বেশি ভিড়। মিষ্টির দোকানে গ্রামের লোকের আনাগোনা আর এদিকটায় শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন, বর্তমান ছাত্র আর কলকাতার অতিথিদের হট্টগোলে জমজমাট। শীতের পোশাকের বাহার, রঙ-বেরঙের শাড়ি, নেকটাই, লেটেস্ট ডিজাইনের কোট, ওভারকোট আর উচ্চকিত হাসির ঝলমলানি। এতো খেতেও পারে লোকেরা। জিভে শান দিতে দিতে ঘুরে বেড়ায় খাবারের দোকানে। 'সন্ধ্যে পাঁচটায় দেখা কর।' 'কোথায়?' 'কালোর দোকানে।' 'ভিড়ে হারিয়ে গেলে কি করব?' 'পৌষালিতে দাঁড়িয়ে থেকো।' 'দুপুরবেলা কি করছ?' 'কিচ্ছু না।' 'চলে এসো মধুচক্রে।'—সব কিছুই এই রেস্তোঁরাগুলি কেন্দ্র করে।

খাবার দোকানের পর আমরা এগোই স্টলের দিকে—মনোহারী

নানা জিনিস, খেলনা, শ্রীনিকেতনের প্রোডাক্টস্‌, হাতীর দাঁতের কাজ, কাঠের কাজ, কাশ্মীরী শাল, কটকী শাড়ি—নানা জিনিসে বোঝাই। মাঝখানে ফাঁকা মাঠে যাত্রা, কীর্তন, কবিগানের বাঁধা আসর। ফাঁকা মাঠে ছড়ি হাতে ঘুরছে ছেলেমেয়েরা, কেউবা বসে বসে চিবোচ্ছে বাদামভাজা। মেলাকে দুভাগ করে রেখেছে রতনকুঠী যাবার রাস্তা। ওপাশেই বেশি ভিড়। পুঁতির মালা, সাঁওতালী গয়না, জুতো, জামা, বাসনকোসন, ফটো স্টুডিও, বটতলার বই, লোহালক্কড়—লাইনের পর লাইন চলেছে। রাস্তার ওপারে বিদ্যাভবন হোস্টেলের কাছে কেবল মাটির হাঁড়ি আর কাঠের ফার্নিচার, দরজা, জানালা ইত্যাদি। রাস্তার এধারে মন্দিরের পাশে মেলা-অফিস, টিকে দেবার ঘর, আর ঝুরি নামা বটের তলায় বাউলের আড্ডা। গানের পর গান চলছে। বাউলরা বলে 'রবিঠাকুরের মেলা' যেমন কেন্দুলিতে 'জয়দেবের মেলা'। রাস্তার দু'পাশে খুচরো জিনিসের দোকান—বেলুন, বাঁশি, চুড়ি আর চানাচুরের চীৎকার।

নাগরদোলার সামনে আসতেই বললাম—

"উঠবেন নাকি নাগরদোলায়?"

"বয়স নেই"—বললেন পানিকর।

"কেন? পণ্ডিত নেহেরু যখন এসেছিলেন গত ১৯৪৫ সালে কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে, নাগরদোলা চড়েছিলেন।"

"সে পণ্ডিতজীর পক্ষেই সম্ভব"—বলতে বলতে এগোন পানিকর। হঠাৎ থেমে বলেন—"আচ্ছা, মেলা তোমাদের কি রকম লাগে?" –

"দারুণ! সারা বছর মেলার জন্যে অপেক্ষা করি। পৌষ উৎসব কবে আসবে। ঠিক বাঙলাদেশের দুর্গাপূজার মতন; দুর্গাপূজায় যেমন সপ্তমী অষ্টমী, নবমী, তেমনি আমাদের সাতই, আটই ও নয়ই পৌষ। ১০ই পৌষ ভাঙা মেলায় দশমীর বিসর্জনের করুণ সুর শুনতে পাই। ষষ্ঠীর বোধনের মত ৬ই পৌষ থেকে আমাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দূর-দূরান্তর থেকে আসেন অতিথির দল, বিশেষ করে

প্রাক্তন ছাত্রেরা। যে যেখানে আছেন 'পড়ি কি মরি' করে ছোটেন শান্তিনিকেতন। মনের টানে। যে আসতে পারল না, মুখ গোমড়া করে দিন কাটায়। এইতো সেদিন আমাদের বলছিলেন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিস শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। সাতই পৌষ এলে কাজে মন বসে না, যত কাজই থাকুক। তাঁর সহকর্মীরাও এই দুর্বলতা জেনে গেছেন। তাই ডিসেম্বর এলেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—'কি, কবে শান্তিনিকেতন রওনা হচ্ছ ?'

আর আমরা যারা এখানে আছি তারা সকাল থেকে রাত্তির টো টো করে ঘুরে বেড়াই, এ দোকান থেকে ও দোকান। ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠানে উপস্থিতি। কবির লড়াই থেকে বাউল গান, নাগরদোলা থেকে সাঁওতাল স্পোর্টস। সমে সমে চায়ের দোকানে আড্ডা। রাত্তিরে আসর জাঁকিয়ে যাত্রামণ্ডপে। এক মিনিট ঘরে থাকি না। মেলা ছাড়লেই মনে হয় বুঝিবা কিছু একটা মজা থেকে বাদ পড়ে গেলাম।"

কথা বলতে বলতে আমরা চলেছি। পানিকর থামলেন এক টুপির দোকানে। মিঃ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করলেন—"শান্তিনিকেতনে এক ধরনের মাথার টুপি আছে শুনেছি, সেগুলো কি এই ?"

মিঃ ব্যানার্জি বললেন—"না, সেগুলি তালপাতার তৈরি, নাম টোকা। চান নাকি একটা ?"

"পেলে তো বেশ ভাল হয়।" বললেন পানিকর।

মিঃ ব্যানার্জি আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন. "কোথায় পাওয়া যেতে পারে ?"

শুভময় বললে—"মেলাতে মিলবে না, তবে জোগাড় করে দিতে পারি।"

"বেশ তাহলে উত্তরায়ণে নিয়ে এসো, তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব। আমি এবার চলি।"

পানিকর চলে গেলেন। আমরা বেরোলাম টোকার খোঁজে।

কোথায় পাই, কোথায় পাই। দোকানে তো মিলবে না, কারো কাছে থেকে চেয়ে চিন্তে নিতে হবে। ভাবছি আর হাঁটছি; হঠাৎ দেখি পাঠভবনের নন্দিতা নামে একটি মেয়ে টোকা মাথায় দিয়ে হেলতে দুলতে চলেছে। শুভময় দৌড়ে ছুটে তার মাথা থেকে টোকা ছিনিয়ে নিলে চিলের মত ঝাপটা মেরে। বললে, "পরে তোমায় জোগাড় করে দেব, এখন ভীষণ দরকার।" মেয়েটার মুখ থেকে কোন কথা বেরোবার আগেই আমরা দে ছুট। সোজা উত্তরায়ণ।

উদয়নের সামনে মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। বললেন—"বাঃ চটপট নিয়ে এসেছেন তো! কোথায় পেলেন?" শুভময় বললে—"একটি মেয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি।"

মিঃ ব্যানার্জি পেশীবহুল হাতে খপ করে শুভময়ের লিকলিকে হাতটা ধরে হেসে বললেন—"ছিনিয়ে এনেছেন? তাহলে তো পুলিস কেস্। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে তো। চলুন আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাই পানিকরের কাছে—" বলেই টানতে টানতে ছুটলেন পেছনের বাগানের দিকে, যেখানে পানিকর বেড়াচ্ছেন নাসেক আর লুসী মীর সঙ্গে।

যেতে যেতে আমি বললুম—"আমরা ছিঁচকে চোর, পড়েছি রঘু ডাকাতের হাতে, কিছুটা নাজেহাল হতে হবে বৈ কি।"

উত্তরায়ণের সুন্দর সুসজ্জিত বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পানিকর, হিমঝুরি আর আমলকী গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়েছে লাল কাঁকরের রাস্তা, দুপাশের ফুলের বাহার। টোকা পেয়ে পানিকর মহা খুশী। মাথায় পরতে পরতে বললেন—'বাঃ চমৎকার জিনিস।" আমি বললুম—"গান্ধীজীরও এই রকম টোকা ছিল। নোয়াখালীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় মাথায় পরতেন।"

ওদিকে শুভময় ব্যাগ থেকে দুখানা বই বের করে ফেলেছে। দুখানাই পানিকরের লেখা। Geographical Factors in Indian History এবং A Survey of Indian History.

উত্তরায়ণের পশ্চিম দিকের বাগানে কৃত্রিম লেকটার কাছাকাছি আসতেই শুভময় বললে—"আপত্তি না থাকে তো আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি।"

"কি বল।"

"এই বইটাতে কিছু ভুল আছে। এক জায়গায় আপনি লিখেছেন মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর। তা তো নয়, ওটা হবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গুরুদেবের পিতা।"

"হ্যাঁ, ওটা ভুলই হয়েছিল, পরের সংস্করণে সংশোধন করেছি।"

"আরেকটা কথা। আপনি লিখেছেন যে, রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে হিন্দুধর্মের 'রিভাইভাল' হয়েছে, কিন্তু তা কি ঠিক?"

"আমি বলতে চেয়েছি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ব্রাহ্মধর্ম ঠিক আগেকার মত রইল না। বহু হিন্দু-আদর্শের নূতন রূপ নিল।"

তারপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব, বর্তমান অবস্থা, রামমোহন রায় ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলতে লাগল। আমরা আলোচনায় মত্ত। লুসী মী এসে আপত্তি তুলল—"না, এ হয় না, তোমরা দুজন এলে আমাদের আর কথা বলা হয় না। তোমরা ছিলে না, বেশ গল্প করছিলাম।"

পানিকর হেসে বলেন—"কি, এদের হিংসে হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা বেশ, তোমাদের সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করব? চীনে খাবার? মিশরের পিরামিড? দক্ষিণ ভারতের মন্দির? নাগা নাচ? কাশ্মীরের কুটির-শিল্প? অক্সফোর্ডের উচ্চারণ? কোনটা?"

"সত্যিই আপনি কত ভাগ্যবান। কত দেশ কত জায়গা ঘুরেছেন।"—বললে নাসেক।

"বাই জোভ্, একে তুমি ভাগ্য বল? আমি তো ঘুরে ঘুরে হয়রান। আর ভাল লাগে না। একবার ভাবি, এখন কিছুদিন দেশে

থেকে বিশ্রাম নিই, বই-টই লিখি। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা নেই।"

"কেন ?"

"শিগ্‌গির বিদেশে যেতে হবে। ডিপ্লোম্যাট-এর জীবন কাটাতে ভাল লাগে না।"

"আপনার 'In Two Chinas' পড়ে তো তা মনে হয় না।"

"সে জোর করে ভাল লাগিয়েছি। কনভোকেশন অ্যাড্রেস্ কেমন লাগল ?"

"আনকনভেনশ্যনাল"—বললে শুভময়।

"রাদার কনট্রোভারশিয়াল"—আমি যোগ দিই। "আপনি যা বলেছেন তা অনেকাংশে সত্যি, কিন্তু আপনার ভয়টা অমূলক। আমরা কেউই পুরনো ভারতে ফিরে যেতে চাই না।"

"তুমি না চাইতে পার, অনেকেই চায়, আর তাদের নিয়েই ভয়। আমাদের তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে, নূতন সমাজ গঠনের দিকে। পেছন-ফেরা মনোভাব তাড়াতে হবে দেশ থেকে। I say always truth, even unpleasant truth, চায়নাতে অনেক ইউনিভার্সিটিতে convocational address দিয়েছি, সেখানেও"—

"Unpleasant truth বলেছিলেন কি ?"—মাঝখানে বলল জন ম্যামন।

"Oh yes, surely."—দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে পানিকরের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে।

এমন সময় মিঃ ব্যানার্জি হাজির সুধাকান্তদাকে নিয়ে। আলাপ করিয়ে দিলেন—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, এককালে গুরুদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন—and he is full of anectdotes। সুধাকান্তবাবুর একটা গল্প বলি শুনুন—রোজ বিকেলে রবীন্দ্রনাথ এক গ্লাস কি যেন খান। সুন্দর টকটকে তার রঙ। সুধাকান্তবাবু ভাবেন, নিশ্চয়ই সুস্বাদু কোন জিনিস, অথচ কি আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ একদিনও তাঁকে খেতে বলেন না। একদিন রবীন্দ্রনাথ টের পেলেন তাঁর মনোবাসনা,

ডেকে বললেন—"কিরে, খাবি নাকি এক গ্লাস?" সুধাকান্তবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। যাক, এতদিনে গুরুদেবের সুমতি হল। ঢক ঢক করে গিলতে গিয়ে দেখেন, ওমা এযে নিমের জল, ঈস্ কি তেতো! রবীন্দ্রনাথের মুখে কৌতুকের হাসি। পানিকরও হেসে ওঠেন। কিন্তু আমরা মিঃ ব্যানার্জির কাণ্ড দেখে একেবারে থ। এযে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপল। আমরা তো শুনেছি, প্রমথনাথ বিশি মশায়ের এরূপ হয়েছিল। লিখেছেনও "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" বইটাতে। যাগগে, চেপে গেলাম। সুধাকান্তদাও অন্যের সখের গল্প বেশ হজম করে নিয়ে বললেন—"কি আর করি, সকলের সামনে পেছপা হলে চলবে কেন, অক্লেশে গলাধঃকরণ করে বললুম—বাঃ খেতে বেশ তো। উপস্থিত সকলে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। আসল রহস্য বুঝলাম আমি আর গুরুদেব।"

ততক্ষণে আমরা পিছনের বাগান পেরিয়ে উদয়নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনে টেনিস কোর্ট, গোলাপ বাগান, মেলার হাঁকডাক।

পানিকর জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, এটার নাম উত্তরায়ণ কেন?"

"বাড়িটার নাম উদয়ন, পুরো কম্পাউণ্ডটার নাম উত্তরায়ণ।"—বললে শুভময়।

"কিন্তু উত্তরায়ণ নাম কেন!"—পানিকর আবার সিগারেট কেস খুললেন।

আমি বললাম—"বাড়িটা শান্তিনিকেতনের উত্তরে। আশ্রমের উত্তরাপথে রবির আবাস, তাই নাম উত্তরায়ণ।"

"মহাভারতের ভীষ্মের শরশয্যার কথা পড়েছ তো!"—সিগারেটে আগুন ধরিয়ে কৌতুকের সুরে পানিকর বলেন—"কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যায়। তিনি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী, তাই অপেক্ষা করেছিলেন উত্তরায়ণ সংক্রান্তির। কামনা করেছিলেন, তখন যেন তার মৃত্যু হয়। গুরুদেবেরও কি সেই রকম কোন ইচ্ছে হয়েছিল! তিনিও কি ভীষ্মের মত কামনা করেছিলেন উত্তরায়ণে মৃত্যুর!"

৯

শান্তিনিকেতন ছাড়লাম সাংবাদিকতার চাকরি নিয়ে, কিন্তু সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে। বারবার যাই, সজ্জন-সঙ্গ করি, ফুলের গন্ধ নাক ভরে নিই, বুক ভরে নিই হাওয়া, আর স্মৃতির রোমন্থন করি।

ডঃ বাগচির পর কিছুদিন অন্তর্বর্তী উপাচার্য হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি নানা অঘটনের পর মেয়াদ শেষ হবার আগেই বিদায় নেন। আবার অন্তর্বর্তী উপাচার্য। হবার কথা ছি- তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের, হলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। ১৯৬০ সালে এলেন সুধীরঞ্জন দাস। শান্তিনিকেতন প্রবল বিক্রমে হাত পা ছড়াতে লাগল। তাঁর আমলেই ঘটা করে হল রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব। কত মানীগুণী এসেছিলেন, আসেন নি একজন—রথীন্দ্রনাথ। তিনি তখন দেরাদুনে নির্বাসনে। কিছুদিন পরে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান।

১৯৮৫ সালে নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল। এলামনি এসোসিয়েসনের ভোটে দাঁড়িয়ে সংসদে নির্বাচিত হলাম প্রাক্তন ছাত্রদের একটা গোষ্ঠী থেকে। আবার অন্য একটি গোষ্ঠীর প্রার্থী হয়ে ভোটে জিতলাম বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিতে। আমারই অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে হারিয়ে। কলকাতায় আসার পর আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক হই। সভাপতি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হই। কঙ্করদার (ক্ষেমেন্দ্র মোহন সেন) বাড়িতে তখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনদের সদর দপ্তর। অবসরের সময় সেখানেই কাটে বেশি।

সে যাই হোক—ছিলাম ছাত্র, ছিলাম অধ্যাপক, হলাম কর্মকর্তা। বোলপুরে নামলে বিশ্বভারতীর গাড়ি আসে, টাটা বিল্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়, উদয়নের বৈঠকখানায় কর্মসমিতির বৈঠকে বসি। ভীষণ অস্বস্তি। নতুন উপাচার্য হয়েছেন ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য। যেমন পণ্ডিত, তেমনি সদালাপী সজ্জন—একজন ষোল আনা ভদ্রলোক। কর্মসমিতিতে বাইরের অন্য সদস্য—যেমন ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি এ এন রায়, জাষ্টিস মাসুদ, ডঃ ভবতোষ দত্ত প্রমুখদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি। চাকরিতে একসটেনশন পাবার জন্য আমারই এককালের অধ্যাপক আসেন আমার কাছে। আমি লজ্জায় মরে যাই। এ আমাকে মানায় না। বিশ্বভারতীর কর্মপরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার আমার নেই। যাঁরা আমাকে ভোটে পাঠিয়েছেন, তাঁদের স্নেহের ও ভালবাসার দান উপেক্ষা করতে পারিনি বলেই আমি পদত্যাগ করতে পারিনি। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় টার্মেও আমাকে ভোটে জিতে আসতে হয়েছিল কর্মসমিতিতে। সঙ্গে ছিল আমারই বন্ধু বরেন সেন।

সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে শুরু হল অশান্তির রাজত্ব। অধ্যাপক-সভা ও কর্মিসভা নামে দুইটি সংস্থা হল কর্মীদের। রাইটার্সে তখন শাসক যুক্তফ্রন্ট। নানারকম দাবিদাওয়ায়, মিছিল ও পোস্টারে ছেয়ে গেল আশ্রম। সেই সময়ই নতুন এবং পুরাতন, প্রাক্তন এবং বর্তমান নামে দুটি শ্রেণী তৈরি করে বিভেদ জাগানো হতে লাগল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, বিশ্বভারতী বন্ধ হবার উপক্রম। কর্মসমিতির বৈঠক চলতে পারে না ঘেরাওয়ের দাপটে। শান্তিনিকেতনের কিছু ঘনিষ্ঠজনেরা সেই ঘেরাও এবং মিছিলে যোগ দেওয়ায় আমি মনে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম।

তা যাই হোক, এলমহার্স্ট এসেছিলেন সে সময়। তিনি ব্যাপার স্যাপার দেখে দিল্লি গিয়ে রিপোর্ট করেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। ইন্দিরা গান্ধী গোপনে একজনকে পাঠান সব দেখেশুনে তাঁর কাছে

তদন্ত রিপোর্ট দিতে। তদন্ত করতে এলেন ডঃ সমররঞ্জন সেন, তখন যোজনা কমিশনের যুগ্ম সচিব, সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ ডিরেকটরের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। সমরদার স্ত্রী আমার সহপাঠিনী অনিতা সেন। সমরদাকে ঘেরাও করা হয় একবার বেশ কয়েকঘণ্টা। দিল্লী ফিরে যাবার পর এই সম্পর্কে তাঁর একজন অতি ঘনিষ্ঠ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ও কিছুনা, আমার স্ত্রী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, ওখানকার লোকেদের সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্ক। শ্বশুরবাড়ীতে জামাইবাবুদের এই রকম একটু আধটু করা হয়েই থাকে।" সমরদা এই ব্যাপারে কলকাতায় আমার মতামত নেন এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে ধীরানন্দ রায় ও কালিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সমরদার রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু প্রশাসনিক অদল-বদল হয় এবং তিনি নিজে দিল্লীর মনোনীত হয়ে আসেন কর্ম-সমিতিতে। কিছুদিন বেশ চলছিল। আবার গণ্ডগোল। ভালো-মানুষ কালিদাসদা পদত্যাগ করলেন উপাচার্য-পদে।

নতুন সমস্যা। উপাচার্যপদে কাকে আনা যায়? দুটি নাম মাথায় এল। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। বয়সের জন্য নির্মল বসু মশাইকে করা গেল না, হলেন প্রতুলবাবু। ভার নিলেন বড় দুঃসময়ে। যোধপুরপার্কে আমার জেঠতুতো ডঃ ভবতোষ দত্তের বাড়িতে কালিদাসদা মাসুদ সাহেব ও আমি প্রতুলবাবুর নাম পাকা করি। চারদিকে নকশালী উৎপাত। শান্তিনিকেতনের চারপাশে তাদের ঘাঁটি। আশ্রমের ভিতরে একজন কর্মী খুন হয়ে গেলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সন্ধ্যে ছটার পর শান্তিনিকেতনের পথে কেউ বেরোয় না। অমিয়দা অর্থাৎ ডঃ অমিয়কুমার সেনকে আনা হল কর্মসচিব করে। তিনিও থাকতে পারলেন না। দিল্লী জারি করল অর্ডিন্যান্স। তারই ভিত্তিতে তৈরি হল মনোনীত কমিটি। রাষ্ট্রপতির মনোনীত হয়ে আমি আবার এলাম সংসদে। প্রতুলবাবুর পর ডঃ সুরজিতচন্দ্র সিংহ। তারপর ডঃ অম্লান দত্ত। বিশ্বভারতী

চলছে। ইতিমধ্যে তাঁর শরীরে জমেছে নানা ব্যাধি। অনেকে অনেক রকম দাওয়াই বাতলান। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক মেলে না।

গত দশ পনের বছরের একটা অতি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিলাম ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। এই সময় নিয়ে বিস্তারিত লেখার অবকাশ আছে। সুখের সঙ্গে দুঃখেরও বারমাস্যা। কিন্তু তার এই রচনা ক্ষেত্র নয়। আমরা যে শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছি. তার সঙ্গে এই শান্তিনিকেতনের মিলের চেয়ে অমিল যেন বেশি। তার কিছুটা অনিবার্য, কিছুটা স্ব-আরোপিত। তবে আক্ষেপের কিছু নেই। আমাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের কালকে ভালবেসেছেন. আমরা ভালবেসেছি আমাদের কালকে এবং আমাদের উত্তরসূরীরা ভালবেসে চলেছে তাদের কালকে। স্মৃতি সততই সুখের ; কিন্তু স্মৃতিরক্ষা বড় কঠিন। তেমনি সৃষ্টির চেয়েও কঠিন সৃষ্টিরক্ষা।

তবে শুধুই কি অমিল ? মোটেই নয়। শান্তিনিকেতনের আলো হাওয়া, তার বিখ্যাত প্রকৃতি এখনও তেমনি উদার, তেমনি অকৃপণ। চৈত্রের মধ্যাহ্নে যখন শালবীথি দিয়ে হাঁটি, শালের মঞ্জরীতে তেমনি পা ঢেকে যায়। অগ্নিকোণ থেকে ঝড় এসে এখনও ওলটপালট করে দেয় হিমঝুরি আর ইউক্যালিপটাসের মিছিলকে। বনপুলকের গন্ধ এখনও মন মাতায়, হলুদ পলাশ তার চাপা ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে ইসারা করে। বকুল গাছের আগায় বসন্তবৌরী ডেকে ডেকে হয়রান হয়। সাঁওতাল মেয়েরা পিয়ার্সন পল্লী যাওয়ার পথে কিঙ্করদার তৈরি মূর্তির দিকে সকৌতুকে তাকায়। আমি যখন আমার ছেলের হাত ধরে পুরোনো ঘণ্টাতলার পাশ দিয়ে হাঁটি, চোখ বুঁজে স্পষ্ট দেখতে পাই তনয়দা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছেন—একপাশে নিরঞ্জনদা অন্যপাশে কাশীনাথদা, দেখতে পাই শ্রীনিকেতনের দিক থেকে মালকোচা মারা ধুতির ঢেউ তুলে ঝড়ের মত ছুটে আসছে বিশ্বজিৎ, রঙিন ছাতা মাথায় খেলার মাঠ দিয়ে গুরুপল্লীতে ফিরছেন মোহরদি,

মুকুটবাড়ির পাশে শিউলি ফুল কুড়োচ্ছে চিত্রোৎপলা আর তান চামেলি, মাথায় টোকা কাঁধে ব্যাগ ভুলু একখানা বই পড়তে পড়তে ছাতিমতলার দিকে চলেছে আর পড়তে পড়তেই গাইছে—তু'হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মত হেসে, হীরেনদার মেয়ে অঞ্জু মাথায় ক্লাসের বই নিয়ে রণপা চড়ে ফিরছে রতনপল্লীতে, গীতু সেতার হাতে যাচ্ছে সংগীতভবন, পাঠভবনের জয় সিং রাঠোর সেগুন গাছের ডগায় উঠেছে পাখির ডিম পাড়তে, চৈতীর পিছনে একের পর এক গান গেয়ে চলেছে চিত্রলেখা মিত্রা সমেত পাঠ ভবনের ছেলেমেয়েরা—আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে; কাঠবেড়ালি সুড়ুৎ করে পালাল প্রাক কুটিরের বারান্দায়, কমলেন্দু টেবিল ঘড়ি হাতে বেরিয়ে এল সতীশকুটির থেকে, কিসের যেন ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং ঢং। নানা সময় নানা ঋতু মিলেমিশে একাকার। এবং এ কী, নীল আকাশ কালিতে মুছে দিয়ে হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি! ক্ষমার গানের ক্লাসের ছোট ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গেয়ে উঠল—ওরে ঝড় নেমে আয়। না, ঝড় নামে নি, মাটি ভিজেছে। আর ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে। এই যে—বয়ঃক্রম পঞ্চাশ পার, কিঞ্চিৎ মুটিয়ে পড়ে হয়েছেন স্থূলাকার—সেদিনের সেই শুকনো রোগা অমিতাভ চৌধুরী মুহূর্তে চলে গেছেন ১৯৪৪ সালে। তিনি হয়ে গেছেন তাঁর ছেলের বয়সী। অমিতাভ আজ অনির্বাণ। স্মৃতির প্রদীপও অনির্বাণ।

সমাপ্ত

এই লেখকের আরো কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা

রবি অনুরাগিনী

কবি ও সন্ন্যাসী

সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ

সংবাদের নেপথ্যে

তিনসঙ্গী-র আরো দুটি প্রণিধানযোগ্য গ্রন্থ

বিমলানন্দ শাসমল-এর

ভারত কী করে ভাগ হলো

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতরে কি আপসের বীজ ছিল? তাই কি দেশ আজ দু'টুকরো? ভারতীয় রাজনীতিতে গোষ্ঠীতন্ত্র কি চিরকালের? তাই কি কিছুতেই এড়ানো যায়নি দেশবিভাগ?

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পুত্র বিমলানন্দ শাসমল এই গ্রন্থে এই আপস-লড়াইয়ের, এই গোষ্ঠীতন্ত্রের অন্ধকারময় ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল ফাঁস করে দিলেন। এই অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে বাঙালার ত্যাগ আর লড়াইয়ের গৌরবময় ভূমিকা মূল্য ষোলো টাকা

তুহিনশুভ্র ভট্টাচার্য-র

রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেন নি

বাঙলা তথা ভারতের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চের দুই প্রখর ব্যক্তিত্ব পরস্পরের কি পরিচিত ছিলেন? কবে? কখন? কখনো কি আকর্ষণ অনুভব করেন নি কেউ ঘনিষ্ঠ হবার? দুই প্রতিভার সৃষ্ট দুই প্রতিষ্ঠান কি কখনো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলো? অথবা পরিপূরক? এইসব অসংখ্য প্রশ্নের তথ্যবহুল আলোচনা এবং সেই সময়ের হুবহু প্রতিচ্ছবি, সাময়িক পত্র পত্রিকার উদ্ধৃতিসহ এই গবেষণাগ্রন্থ চিন্তাভাবনার জগতে এক তুমুল আলোড়ন তুলেছে। মূল্য পনেরো টাকা